A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

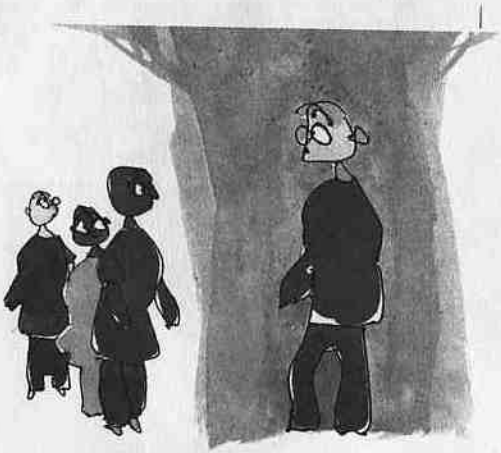

দিলুর গল্প

নতুন সংস্করণ : ২০০৯

প্রকাশক
তপন মাহমুদ
বিজয় প্রকাশ
১২ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০।

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
৩০/৫ নয়াবাজার
ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

Dilur Galpa; Rahat Khan Published by Tapan Mahmud, Bijoy Prokash, 12 Banglabazar, Dhaka 1100. First edition : February 2010. Cover Design : Dhrubo Esh.

Price : Taka 100.00 Only.

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত বাবা ও মাকে

দিলুর গল্প

এক

সেবার আমাদের চৌধুরীপাড়ায় একটা ছেলে এল, নাম দিলু। খুব লম্বা না দেখতে কিন্তু বেশ মজবুত শরীর। মাথায় সজারুর কাঁটার মতো চুল। একদিন বিকালবেলা আকবরদের বাগানের সামনে বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় দিলু এসে হাজির হয় সেখানে।

আমরা তাকে পাত্তা না দেবার চেষ্টা করি। নতুন 'লেফটেন্যান্ট' [সাজাহান ভাই'র ভাষায়] হয়েছে, আগে তো বুঝি কেমন ছেলে, তারপর দলে নেয়া যায় কি না বিবেচনা করা যাবে। আমরা দিলুকে দেখেও না দেখার ভান করি। গল্পে মগ্ন হই।

'তারপর বুঝলে তো গেলাম শ্মশানে', সুনির্মল আগের গল্পের জের টানে, 'শনিবার রাত, তার উপর অমাবস্যা, আমি তো ভয়ে বাঁচি না ... এমন সময় নাকি গলায় ...'

আমাদের অবহেলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিলু একদম আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এমন ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেলে দাঁড়াল যে আমরা চোখ না তুলে পারলাম না।

'কী চাই?' রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে গজা।

'আমার পোষা বাঘটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে', দিলু বিষণ্ন গলায় বলে, 'তোমরা কেউ আমার বাঘটাকে দেখেছ?'

'বাঘ! পোষা বাঘ!' আমরা সবাই তাজ্জব। আকবর বলে, 'তুমি বাঘ পোষো, মানে টাইগার?'

'সরি', জিভ কাটে দিলু, 'সামান্য ভুল হয়ে গেছে। বাঘ না, ছাগল, আমার পোষা ছাগলের কথা বলছি। তোমরা কিছু মনে কোরো না, ভাই। এরকম বেমক্কা কথা না বললে কি তোমরা পাত্তা দিতে কখনো? তা কী বলো, বসতে পারি তোমাদের আড্ডায়?'

সাজাহান ভাই থাকলে গম্ভীরভাবে বলত, 'ফিট।' দলের ডেপুটি লিডার সুনির্মল বলে, 'পার। তোমার নাম কী?'

'দিলু।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস সেভেনে।'

'কোন স্কুল?'

'মৃত্যুঞ্জয় স্কুল।'

আমরা সবাই ওই স্কুলের ছাত্র। সুতরাং ছেলেটাকে দলে স্থান দিতে অসুবিধে নেই। পাড়ারই ছেলে, তদুপরি বোঝা গেল বেশ চালু ছেলে।

সুনির্মল গম্ভীর গলায় বলে, 'বেশ, বসে যাও।'

সেই থেকে দিলু আমাদের দলের একজন হয়ে গেল।

আমাদের ক্লাবে প্রতি মাসে একটা করে সাহিত্য-সভা হয়। আমরা নিজেরাই খেটেখুটে ব্যবস্থা করি। কেউ গল্প-কবিতা পাঠ করে, কেউ গান শোনায়, কেউ-বা কমিক দেখায়। অনুষ্ঠানের ধরন যাই হোক আমরা এটাকে বলি সাহিত্য-সভা। সেবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সভায় রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ঘটনাটা আর কিছু নয়। প্রতি সভায় আড্ডার এক একজন সদস্যকে সভাপতি করা হয়। সভাপতির তেমন কোনো কাজ নেই। শুধু চেয়ার জুড়ে সারাক্ষণ বসে থাকা, আর সভাশেষে উপস্থিত সকলকে লজেঞ্চুস, বিস্কিট, ডালমুট এসব বেঁটে দেয়া। সেবার প্রদীপের সভাপতি হওয়ার পালা। তা প্রদীপ কিছুতেই সভাপতি হবে না। এমনিতে নিরীহ গো-বেচারা। তার উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলার ব্যাপার হলে সটান চোখমুখ উল্টিয়ে দেয়।

আকবর বলল, 'না বললে চলবে কেন? এটাই নিয়ম।'

প্রদীপ বলল, 'মাফ করে দাও।'

গজা বলল, 'মাফ করে দেয়ার কী আছে? সবাই যখন অত করে বলছে ... হয়ে যা না।'

দিলু হাত-পা ছুড়ে বলল, 'হ্যাঁ, রাজি হয়ে যা। আমরা তো আশপাশে আছিই। ভয় কী?'

প্রদীপ অনন্যোপায় হয়ে সভাপতি হতে রাজি হল। সভার কাজ শুরু হলো। মাঝখানে প্রদীপ সভাপতির আসনে চোখ-কান বুজে কোনমতে বসে রইল। সভার কাজ নির্বিঘ্নেই শেষ হল। এখন লজেঞ্চুস বেঁটে দেবার পালা। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথাও লজেঞ্চুসের প্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

সুনির্মল ফিসফিস করে বলল, 'প্যাকেটটা আনতে ভুল করিস নি তো?'

গজা চটেমটে বলল, 'ভুল করব মানে? আমি নিজের হাতে টেবিলের উপর প্যাকেটটা রেখেছি!'

'তা হলে?'

আমরা সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলাম। হঠাৎ সুনির্মলের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। সে অপলক দৃষ্টে দিলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

'দিলু, এদিকে শোন।'

'আমি এখন ব্যস্ত।'

দিলু জবাব দিল, আমার আঙুলের 'ঠাস' হয়েছে। আঙুল ফোটাচ্ছি।

'বটে ... আঙুল ফুটাচ্ছ!'

সুনির্মল দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে। কাছে এসে হুকুমের গলায় বলে, 'লজেঞ্চুসের প্যাকেটটা এক্ষুণি বের করে দে।'

'মানে? আমি কোত্থেকে বের করে দেব?'

'গোলমাল করিস না বলছি। দিয়ে দে।'

দিলু স্থির হয়ে সুনির্মলের দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল। থেমে থেমে বলল, 'তা হলে তোর ধারণা হয়েছে ওটা আমি নিয়েছি?'

'তুই নিসনি?'

'না, নিই নি ... তবে ...' বলে হঠাৎ দিলু ঘুরে দাঁড়াল। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল। বলল, 'তবে কে নিয়েছে তা এখুনি বার করে দিতে পারব বোধহয়। আমি হলাম গিয়ে ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। দাঁড়া, এক মিনিট।'

সভায় নিস্তব্ধতা। গোলমালে সভাপতি প্রদীপ চেয়ারে বসে উসখুস করছে। তার চোখমুখ লাল। হাত দুটি ভেজা ভেজা। সে কাঁপছিল।

প্রদীপের কাছে গিয়ে দিলু বলল, 'পকেট থেকে প্যাকেটটা বের কর তো দেখি।'

প্রদীপ আগেই কাঁদো কাঁদো হয়েছিল। এবার সোজা কেঁদে ফেলে বলল, 'আমি আগেই বলেছিলাম ওসব সভাপতি-টভাপতি হব না ... তা সভাপতি করেছে—করেছে— চোখের সামনে আবার রেখেছে পুরো একটা লজেঞ্চুসের প্যাকেট! আমি কী করব?'

'না, না ... তুই কী করবি? করার কিছু ছিল না বলেই তো প্যাকেটটা মেরে দিয়ে বসেছিলি!' দিলু বলল।

প্রদীপের জোব্বা থেকেই প্যাকেটটা বেরুল। দিলু মাথা নেড়ে বলল, 'একটাও দেখছি খায় নি ... অপদার্থ কোথাকার, খামোকা সটকেছিল।'

কোকাতে কোকাতে প্রদীপ বলল, 'খাওয়ার সময় পেলাম কোথায়? মাত্র পকেটে পুরেছি ... তখনই প্যাকেটের খোঁজ পড়ল।'

হঠাৎ সভার পেছন থেকে সামনে 'দুয়ো দুয়ো' উঠতে লাগল। আকবর ফিসফিস করে বলল, 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে ... তাঁতিপাড়ার ছেলেরা লুকিয়ে মিটিং দেখতে এসেছে! ব্যাপারটা ওরা জেনে ফেলেছে! আর রক্ষা নেই ... এবারে অন্য পাড়ার ছেলেদের কাছে আমাদের মুখ দেখাবার জো রইল না!'

দিলু লাফিয়ে সামনে এল। ফিসফিস করে আমাদের বলল, 'দাঁড়া না ... একটা কিছু ম্যানেজ করছি। ভয় কী?'

তারপর সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইসব, এইমাত্র আপনারা যা দেখলেন এটা হল আমাদের সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম কার্যসূচি।'

'আপনারা দেখছেন আমাদের সভাপতি প্রদীপ তার চেয়ারে বসে কী রকম হাপুস-হুপুস বিলাপ করে কাঁদছে। এটা কিন্তু সত্যি সত্যি কান্না নয়। কমিক—কান্নার নকল—'

শুনে প্রদীপ যে প্রদীপ তার পর্যন্ত কান্না থেমে গেল। দিলুর জোরালো বক্তৃতায় গোলমাল থেমে গিয়ে সভায় আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তাঁতিপাড়ার একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'প্রথম কর্মসূচি তো গেল—এখন দ্বিতীয়টা শুরু কর তা হলে।'

'এই তো করছি—'

দিলু একগাল হাসল। হঠাৎ নুয়ে পড়ে সুনির্মলকে কী যেন বলল। সুনির্মল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এবারে খোনা গলায় গান পেশ করবে আতিকুর রহমান।'

ঘোষণা শুনে ভিরমি খেলাম। এ যে দেখছি ঘোষণায় আমারই নাম বলা হল। বুঝলাম প্রদীপের দশা পেতে আমারও বেশি দেরি নেই। ভিড় বাঁচিয়ে সটকে পড়তে চেয়েছিলাম। গজা আর আকবর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। চ্যাংদোলা করে আমাকে ডায়াসে নিয়ে যাওয়া হল। আমার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। একগাল হেসে দিলু আবার বলল, 'এখন আতিক সঙ্গীতে করুণ রস পরিবেশন করবে।'

দিলুর দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললাম, 'দোষ-ত্রুটি কিছু করে থাকি তো মাফ করে দে। আর করব না।'

'শুরু কর—জলদি—জলদি—'

সভায় হট্টগোল উঠল।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি সবাই মিটমিটিয়ে হাসছে। তা হাসবে না! এমন একটা জবর পজিশনে পেয়েছে, পয়সা দিয়েও তো এই দৃশ্য দেখা যায় না—হাসবেই তো।

'শুরু কর—শুরু কর—'তুমুল চিৎকার উঠল।

তারপর কী ঘটল আমি নিজে জানি না। হঠাৎ দেখি গলা দিয়ে কী সব বিচিত্র রকমের আওয়াজ বেরুচ্ছে। খুব সম্ভব একটা গান গাওয়ারই প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছিল। তা গান কী রকম গেয়েছিলাম বলতে পারি না, তবে আমার গলায় যে এমন সব বিচিত্র আওয়াজ আছে—কোনটা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, কোনটা নিচে নামতে গিয়ে ভেঙে যায়, আবার জোড়া লাগতে লাগতে এক মিনিট দুই মিনিটের ধাক্কা, কোনটা স্টার্ট নেয়া এঞ্জিনের মতো থরথর কাঁপে—এসব জানতাম না।

গান শেষ হলে তুমুল হাততালি আর হাসি। আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। কোনরকমে ডায়াসের পেছনে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লাম।

দিলু আবার কী যেন ফিসফিস করে সুনির্মলকে বলল। সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবারে গল্প বলে শোনাবে দিলু।'

দিলু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'তোমরা বোধহয় জান না আমার বড় মামা মস্ত বড়লোক। দুনিয়ার নানান জায়গায় তাঁর কারবার আছে। সুইজারল্যান্ডে আছে তাঁর ঘড়ির দোকান, বাকুতে তেলের খনি, নিউইয়র্কে অপেরা হাউস, লন্ডনে হীরা-জহরতের কারবার, টোকিয়োতে পেশাদার সার্কাস-পার্টি, দিল্লিতে

গালিচা-শতরঞ্জির ব্যবসা আর নারায়ণগঞ্জে পাটের গুদাম। তা বড়লোক হলে কী হবে মামা খুব খেয়ালী মানুষ। যে গল্পটা তোমাদের বলতে যাচ্ছি সেটা বহুদিন আগে ঘটেছিল। ধর আজ থেকে বিশ বছর আগে। মামার তখন মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু হলে কী হবে সেই বয়সেই দুনিয়ার সব বড় বড় নামজাদা লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। গল্পটা তাঁরই মুখ থেকে শোনা। সেবার মামার হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তাঁর দেশের বাড়িতে তিনি একটা জাঁদরেল পার্টি দেবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। দুনিয়ার বাছা বাছা লোকদের দাওয়াত করা হল। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে গাঁয়ের ফুটবল খেলার মাঠটাকে করা হল এ্যারোড্রোম, খাল কেটে কুমির নয়, জাহাজ আনার ব্যবস্থা হল বড় নদী থেকে। শয়ে শয়ে লোক রাখা হল নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। নিমন্ত্রণ করা হল ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ আর রানী মেরীকে, আফগানিস্তানের বাদশা আমানুল্লাহ আর সুলতানা সুরাইয়াকে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর মিসরের ফারুককে। এ ছাড়া নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রইলেন আগা খান, মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন, অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো, শিল্পী পিকাসো, রোমের পোপ আর বড় মামার একমাত্র শ্যালক মিঞা আমিনুদ্দি।

'বটে? বটে? তারপর?' শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

'তারপরের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।' দিলু কতকটা দুঃখিত গলায় বলল, 'আগেই বলেছি বড় মামা খুব খেয়ালী। খুব শান-শওকতের সঙ্গে পার্টির ব্যবস্থা করলেন তিনি। মহামান্য অতিথিবৃন্দ আনন্দের সঙ্গেই তাঁর পার্টিতে যোগ দিলেন। কিন্তু আমার খেয়ালী বড় মামা খাবার কী ব্যবস্থা করলেন জান?'

'নিশ্চয়ই পোলাও-কোরমা, জরদা-কালিয়া?'

'অথবা ইংলিশ ডিস?'

'চাইনিজ ডিনার?'

সবাই নিজের নিজের ধারণা জানায়। দিলু বিষণ্ন গলায় বলে, 'না হে। ওসব কিছু না। তবে আর বললাম কেন বড় মামা খেয়ালী মানুষ? বড় মামা মেহমানদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন মগর আলী মিঞার দোকানের পেঁয়াজু।'

'পেঁয়াজু?'

'হ্যাঁ, ভাই। বড় মামার পার্টি থেকে ইংল্যান্ডে ফিরেই নাকি ষষ্ঠ জর্জ ইন্তেকাল করেন। শোনা যায় তখন থেকেই ইংল্যান্ডের লোকেরা প্রতি বছর পেঁয়াজু দিবস পালন করে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে নিষ্ঠুর হত্যাকারী "জনের" পরই নাকি মগর আলী মিঞার নাম লেখা হয়।'

তুমুল করতালির মধ্যে গল্প বলা শেষ হল। কিছুক্ষণ পরে সভাও ভাঙল। একটা কিছু গোলমাল করতে না পেরে তাঁতিপাড়ার ছেলেরা মনমরা হয়ে ফিরে গেল। পাড়ার ছেলেরা মহা খুশি। তারা এসে দিলুর পিঠ চাপড়ে দিল। গজা হাত

তুলে বলল, 'ডেপুটি লিডার ...' সুনির্মল ওর মুখ চেপে ধরল। তারপর নিজেই বলল, 'লিডার দিলু।'

সবাই হাঁক ছাড়ল, 'জিন্দাবাদ!'

দিলু তখন প্রদীদের কাছ থেকে লজেঞ্চুসের প্যাকেটটা নিয়ে সমানে লজেঞ্চুস মুখে পুরছে।

দুই

এই ঘটনার পর আমাদের পাড়ায় দিলু খুব জনপ্রিয় হয়ে গেল। সবাই দিলুকে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করল। কিন্তু আমাদের দল ছেড়ে দিলু কোথাও গেল না। আমার সঙ্গে তো রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একই স্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র বলে মেলামেশা বা একসঙ্গে থাকার সুবিধেও ছিল আমার বেশি।

একবার ক্লাসে এক মজার ঘটনা ঘটল। মোতি স্যার ক্লাসে নতুন মুখ দেখে দিলুকে বলেছিলেন, 'দাঁড়াও তো বাপু, কী নাম?'

দিলু দাঁড়িয়ে নিজের নাম বলল। পাশে বসা জলিলের নাম বলল, কিবরিয়ার নাম বলল, প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের নাম বলল এবং পরের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর নাম জানি না।'

কাণ্ডকারখানা দেখে মোতি স্যার চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন। দিলুর কথা শেষ হবার পরই বললেন, 'বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।'

বলামাত্র দিলু বেঞ্চের উপর দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল' তার আগেই মোতি স্যার রেগেমেগে বললেন, 'অপদার্থ, ডেঁপো কোথাকার।'

ক্লাসের মাঝখান থেকে একটি নিরীহ গলার প্রশ্ন শোনা গেল—ডেঁপো মানে কী, স্যার?'

'কে কথা বলল?' মোতি স্যার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন— 'আবিদ না, দাঁড়া, দাঁড়া বলছি!'

আবিদ দাঁড়াল।

মোতি স্যার বললেন, 'সুলতান ইলিয়াস শাহ কে ছিলেন বল্ দিকি।'

আবিদ মাথা চুলকে বলল, 'পারব না, স্যার।'

মোতি স্যার উঠে গিয়ে আবিদের কান ধরতে গেলেন। হা হা করে উঠল আবিদ।

'স্যার, আমার কান পেকেছে।'

মোতি স্যার থমকে গেলেন। পরে আবিদের মাথার চুল ধরলেন। গালে প্রমাণ সাইজের দুটো থাপ্পড় দিয়ে বললেন, 'যে ছেলে পড়া তৈরি না করে স্কুলে আসে আর শিক্ষকের বিরক্ত করার দায়ে মার খায়, তাকে ডেঁপো ছোঁড়া বলে। বুঝেছ এইবার?'

আবিদ ভুক ভুক করে কাঁদতে লাগল। দেখাদেখি দিলুও কাঁদতে লাগল। মোতি স্যার খুব বিব্রত বোধ করলেন এইবার। রাগী মুখে বললেন, 'এই ছেলে, তুমি কাঁদছ কেন? তোমাকে তো মারি নি।'

'মারেন নি তাতে কী হয়েছে?' দিলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল 'আমার, স্যার, হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। আমাকে মাফ করে দিন, স্যার। আমি এখন না কেঁদে পারব না।'

মোতি স্যার নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে বড় বড় চোখে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর ক্লাসে কখ্খনো এমন হয় না। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আজ তোমাদের ছুটি। বারান্দায় গণ্ডগোল কোরো না। চুপচাপ চলে যাও।'

রেজিস্ট্রি খাতা, চক, ডাস্টার নিয়ে মোতি স্যার সোজা হেডমাস্টার সাহেবের ঘরের দিকে ছুটলেন। আমরা গিয়ে দিলুকে একেবারে ছেঁকে ধরলাম। তার সুবাদেই তো ছুটিটা পেয়ে যাওয়া। নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম আমরা তাকে। দিলু কেঁদে যাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্যে কান্না থামিয়ে বলল, 'আরো এক মিনিট আমি কাঁদব। তোমরা আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না।'

আমরা সব হাঁ করে রইলাম। দিলু মুখ গোলমতো করে কেঁদে চলল। গলা দিয়ে হেঁড়ে আওয়াজ বের হচ্ছে। চোখ বেয়ে দর দর করে পানি পড়ছে। দেয়ালঘড়িতে মাঝে মাঝে সে সময় দেখছিল। এক মিনিট যেতেই সে কান্না থামাল। জামার হাতা দিয়ে চোখমুখ মুছল। আমাদের সবাইকে বলল, 'দাঁড়া, একটা ওষুধ খেয়ে নিই। তা না হলে আবার কেঁদে ফেলব।'

দিলু ওষুধ খেল। আমি বললাম, 'তোমার তা হলে কান্নার অসুখ আছে?'

'তা থাকবে কেন?' দিলু বলল, 'কান্না কী একটা অসুখ? কান্না হল কান্না।'

'ওষুধ খেলে যে?'

'খেলাম!' দিলু জবাব দেয়, 'মোতি স্যারের তিন সের ওজনের থাবার চড় খাওয়ার চেয়ে এই লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়া ঢের সহজ। তাই না?'

আমরা হাঁ করে রইলাম।

'এখন সব বুঝবে না। পরে বুঝিয়ে দেব।'

এই হল স্কুলে প্রথম দিনের ঘটনা। তারপর দিলুকে নিয়ে অনেক মজার কাণ্ড ঘটল। একদিন সে শ্রেণীশিক্ষকের কাছে স্কুলের মাইনে দিচ্ছিল। স্কুলে নিয়ম আছে দুদিন বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে এক আনা জরিমানা দিতে হবে। শ্রেণীশিক্ষক জিতেন বাবু দিলুর মাইনে নিতে গিয়ে বললেন, 'তোমার মাইনে হল পাঁচ টাকা। দুদিন অনুপস্থিত। এক আনা জরিমানাসহ মোট পাওনা হল পাঁচ টাকা এক আনা।'

দিলু বলল, 'জরিমানা আনি নি, স্যার। তবে জরিমানা মাফের দরখাস্ত এনেছি।'

'কই দেখি?' জিতেন স্যার হাত বাড়ালেন।

দিলু সাবধানে পকেট থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে সারের হাতে দিল। পড়তে পড়তে জিতেন বাবুর চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বললেন, 'এটা কী?'

'দরখাস্ত, স্যার!'

জিতেন বাবু কৌতুক ভরা চোখ দুটি তুলে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'দরখাস্তে তুমি কী লিখেছ মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন? আমিই নিজের হাতে ওটা লিখেছি, স্যার।'

'হুঁ, পড় তো।'

দিলু উচ্চৈঃস্বরে পড়ল। দরখাস্তটি এইরূপ :

মাননীয় প্রধান শিক্ষক,

মৃত্যুঞ্জয় স্কুল সমীপেষু,

স্যার,

আমি এই মাসের তের ও চোদ্দ তারিখ স্কুলে আসিতে পারি নাই। নিম্নে ইহার যথাযথ কারণ বর্ণিত হইল।

আমি তের তারিখ সকাল সাড়ে ন'টায় বাড়ি হইতে স্কুলের দিকে রওনা দিই। যখন কেবল অর্ধেক পথ আসিয়াছি, তখন কোথা হইতে পঞ্চাশটি বানর হাঁ হাঁ করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি একটি বাড়িতে আশ্রয় নিই। ভয়ে আর বাহির হইতে সাহস করি নাই। সেই দিন বাড়ি গিয়া আমি ঘটনাটি বাবাকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন। তিনি বলিলেন, একসঙ্গে নাকি তিনটা বানরই কখনো দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি পঞ্চাশটি বানর দেখিলাম কী করিয়া? এইরকম যুক্তি দেখাইয়া তিনি আমাকে প্রহার করিলেন। রাতে জ্বর আসিল। সুতরাং পরের দিনও স্কুলে আসার অবস্থা রহিল না। ফলে দুইদিন আমাকে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি স্কুলে দুইদিন অনুপস্থিত থাকার জরিমানা মাফ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

বিনীত,
দিলোয়ার হোসেন
সপ্তম শ্রেণী, 'ক' শাখা

এই উদ্ভট দরখাস্ত শুনে খোদ হেডমাস্টার সাহেবের কাছে দিলুর ডাক পড়ল। হেডমাস্টার সাহেব ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন না। পরে তাঁর বিপুল গোঁফের উপর ছোট একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'খুব বুঝি সুকুমার রায় পড়িস?'

ঢোক গিলে দিলু বলে, 'জি, স্যার।'

'আর কখ্খনো এরকম করবি না! ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, স্যার, করব না।'

'এখন যা। তোর জরিমানা মাফ করে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে দুষ্টুমি করলে ...'

হেডমাস্টার সাহেব থামলেন। টেবিলের নিচে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ভবিষ্যতে ওরকম দুষ্টুমি করলে প্রথমে তুলে আছাড় দেব। পরে নাম কেটে স্কুল থেকে বার করে দেব।'

দিলু প্রথমে বিনয়ে হাসতে যাচ্ছিল। কথা শুনে ঢোক গিলল। আদাব দিল এবং ঘর থেকে বের হয়ে এল।

হেডমাস্টার সাহেবের এই ধাতানির পর দিলুর স্বভাব যে বদলে গেল তা বলা যায় না। তবে ক্লাসে মোটামুটি শান্ত থাকত। নেহাৎ দায়ে না পড়লে কথা বলত না। তার ওপর স্কুলে সবচে' বেশি রাগ ছিল মোতি স্যারের। দেখতাম মোতি স্যারের ক্লাসে খুব জুতসই হয়ে বসে দিলু মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। মোতি স্যার প্রথমে ওকে আমল দিতেন না। পরে যখন দেখলেন ছেলেটি খুব নিরীহ আর শান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি দিলুকে রীতিমতো আদর করতে লাগলেন। প্রায়ই বলতেন, 'দুষ্টু ছেলেদের আমি পছন্দ করি, বুঝলে? কিন্তু পড়াশোনা না করে যে দুষ্টুমি করে তাকে পছন্দ করি না। মন দিয়ে তোমরা সব লেখাপড়া কোরো। খেলার সময় খেলাধুলা কোরো। দেখবে তোমাদের আমরা কত ভালবাসছি।

মোতি স্যার ইতিহাস পড়াতেন। একটা আধটা ভূগোলের ক্লাসও নিতেন। দিলু ইতিহাস আর ভূগোলে খুব উৎসাহ দেখায়। বলে, 'খুব মজার বিষয় যাই বলিস। একটা ব্যাপার দেখলাম, ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক আছে। ভূগোলের সাথে মিলে যায় ইতিহাস। তাজ্জব ব্যাপার, তাই না?'

ব্যাপারটা আমরা বুঝি নি। তাই চুপ করে রইলাম। দিলু বলল, 'আমি ঠিক করেছি পড়াশোনা আর একটু মনোযোগ দিয়ে করব। পরীক্ষায় ভাল করতে হবে।'

সত্যি কথা বলতে কী দিলু সারা বছর খুব হৈ-চৈ করে পড়াশোনার কথা বলল। ক্লাসের প্রথম ছেলে, দ্বিতীয় ছেলেরা প্রায় ঘাবড়ে যায় আর কী। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল দিলু ফেল করেছে। সব বিষয়ে পাস, ফেল করেছে ইতিহাস আর ভূগোলে। আমরা সব শুনে বোকা বনে গেলাম।

দিলু গিয়ে হেডমাস্টার সাহেবকে খুব ধরল, 'স্যার, এবারের মতো উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দিন। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ব।'

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। মোতি সাহেব ইতিহাস আর ভূগোল খাতা দেখেছেন। তিনি যদি বলেন তা হলে তোমাকে উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দেব।'

দিলু গিয়ে মোতি স্যারকে ধরল, 'স্যার, দয়া করে ...'

এইটুকু বলতেই মোতি স্যার বিকট চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, 'অসম্ভব! তুমি যাও বলচি। গেট আউট!'

গর্জন শুনে দিলু তো দিলু, আমরা সবাই ছিটকে পড়ি ঘরের বাইরে।

মোতি স্যারের এমন মারমুখী মূর্তি আর কখনো দেখি নি। আমরা সবাই তাজ্জব। দিলুকে বলি, 'কী রে, অত রাগ করেছেন কেন স্যার?;'

'জানি না। আমি ...' ঢোক গিলে দিলু বলল, 'আমি ইতিহাস আর ভূগোল দুটোই একসঙ্গে দেখাতে গিয়েছিলাম। ইয়ে, মানে ...'

দিলুকে ওপরের ক্লাসে সেবার উঠানো হয় নি একটি প্রশ্নোত্তরের জন্যে। প্রশ্নটা ইতিহাসের। প্রশ্নটা ছিল ঔরঙ্গজীব কে ছিলেন? তাঁহার যুদ্ধ বিজয়ের কাহিনী লিখ। উত্তরে দিলু লিখেছিল, 'ঔরঙ্গজীব শিবাজীর পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে উত্তরাঞ্চল জয় করিলেন। জয় করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইতে হইতে হইতে হইতে আর পারিলেন না। কারণ পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে একটু চ্যাপ্টা।'

তিন

পরীক্ষায় ফেল করে দিলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। খবর পেয়ে ছুটিতে একদিন আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি সে বারান্দায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখিত দুঃখিত চেহারা। আমাদের দেখেও দিলুর কোনো ভাবান্তর নেই। যেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমার সাথে হেডমাস্টার সাহেবের ভাগ্নে গজা। সে আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'চল, পালাই। দিলুর মা-বাবা দেখতে পেলে না আমাদেরই "নিল ডাউন" করিয়ে রাখেন।'

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বটে। আমাদের ক্লাসের সবচাইতে গাধা ছেলে হলো শামসুল। একদিন বাংলার মীর্ধা স্যার ওকে একটা বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শামসু বানান কর তো যুদ্ধ।'

শামসু অনেকক্ষণ মাথা চুলকিয়ে তারপর বলতে শুরু করেছিল, 'বর্গীয় জ ...'

'থাক, থাক ...'

মীর্ধা স্যার থামিয়ে দিয়েছিলেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। সেই থেকে তাঁর ক্লাসে দুটো কানমলা আর একটা চাঁটি শামসুর বরাদ্দ। যেদিন শামসু ক্লাসে থাকে না সেদিন স্যার খুব অসুবিধেয় পড়েন। তবে আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আর তেমন অসুবিধে কী? হয়তো দেখা গেল শামসু না থাকাতে দুটো কানমলার একটা গেল মনোয়ারের ভাগে, একটা হোসেনের, আর চাঁটিটা প্রায়ই হয় আমার মাথায় নয় গজার মাথায়। গজা এজন্যে খুব মর্মাহত। একদিন তো সে বলেই ফেলেছিল, 'স্যার।'

'কী বলছ ...'

'রোজ রোজ চাঁটি না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ কানমলা দিলে পারেন, স্যার ... বলছিলাম কী ...'

সারের অগ্নিমূর্তি দেখে গজা আর এগোয় নি। স্যার বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। এবার থেকে শুধু চাঁটি তোকে দেয়া হবে না। বেশ ভাল রকম একটা কানমলা দিয়ে তারপর চাঁটি দেয়া হবে—দাঁড়া মজাটা টের পাওয়াচ্ছি পাজি কাঁহেকা।'

গজার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'তাহলে তো দেখছি কথা বলে অন্যায় হয়ে গেছে, স্যার! মাফ করে দিন। এখন থেকে চাঁটিই দেবেন, স্যার। আর আপত্তি করব না।'

সেই ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ল।

গজা বলল, 'ভাবগতিক যেমন দেখছি আতিক, সুবিধে মনে হচ্ছে না। এই দ্যাখ না দিলুটা একদম চুপ। কথা বলছে না। চল পালাই।'

এইবার দিলু হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে দুই পায়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে আবার ভেতরের দেয়ালঘড়ি দেখছে সে। দেখে ফিক করে হেসে উঠল। বলল, 'আধ মিনিট বাকি আছে। থাকুক গে।'

'আধ মিনিট মানে?' গজা জানতে চাইল।

'আধ মিনিট মানে এক মিনিটের অর্ধেক, বুঝলে না?' দিলু একটা বড়সড় হাই ছাড়ল। বলল, 'ষাট সেকেন্ডে হলো এক মিনিট আর আধ মিনিট হলো তোমার তিরিশ সেকেন্ড ...'

'আহা, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আধ মিনিট বাকি আছে মানেটা কী?'

'বুঝতে পারছ না?' দিলু চোখ বড় বড় করে তাকাল। কী যেন সে ভাবল।

বলল, 'ওহো, তোদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এখন তো স্কুল বন্ধ। যদ্দিন স্কুল না খুলছে তদ্দিন ছুটিতে আমি একটা রুটিন মেনে চলেছি।'

'কিসের রুটিন?'

'দাঁড়া, তোদের দেখাই ...' বলে দিলু লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। ফিরল লম্বা একটা কাগজ নিয়ে। কাগজটা আমাদের হাতে দিয়ে বলল, 'পড়।'

একটা পুরোদস্তুর রুটিন। উপরে সময় লেখা, নিচে কাজের ফিরিস্তি। রুটিনটা এই রকম :

সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা—ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধোয়া। নাশতা খাওয়া।

সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা—পড়াশোনা করা।

সাড়ে ন'টা থেকে দশটা— গোসল ও খাওয়া।

দশটা থেকে ১টা পর্যন্ত :

প্রথম ঘণ্টায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা। [যে কোন পা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে কোন সময়ই একটা পায়ের বেশি দুইটি পা না]

দ্বিতীয় ঘণ্টায় প্রথমার্ধ, নাকে খৎ দেয়া।

দ্বিতীয় ঘণ্টার দ্বিতীয়ার্ধ, ঔষধ ব্যবহার না করে ক্রন্দন [চিৎকার করিয়া কাঁদিলে চলিবে না। নিঃশব্দে কাঁদিতে হইবে]

তৃতীয় ঘণ্টায়, নিজের হাতে চড় ও কানমলা খাওয়া [ইচ্ছা করিলে এই সময় কিছু চিৎকার করা যাইবে ... কিন্তু কাঁদা চলিবে না]।

এই রুটিন দেখে তো আমরা থ। দিলু বলল, 'স্কুলে গেলে তো খেতেই হবে। তারচে' আগে থেকে প্র্যাকটিস রাখা ভাল।'

'কিন্তু' গজা দুঃখিত হয়ে বলল, 'তুই এই রকম খেপে গেলি কেন, ভাই, পরীক্ষায় ফেল করেছিস বলে?'

'মনে কর তাই।'

দিলু আমাদের ঘরের ভেতর এনে বসাল। বসিয়ে বাইরে গেল। বাইরে থেকে শেকল তোলার আওয়াজ পেলাম। দিলু ঘরে এসে ঢুকল ভেতর বাড়ির দরজা দিয়ে। বলল, 'তোরা একটু বস। আমি কাজটা সেরে ফেলি।'

'ভাই দিলু' আমি বললাম।

'কী রে?'

'ব্যাপারটা কি ডবল হয়ে যাচ্ছে না? ধর, স্কুলে গিয়েই যা বিনা পরিশ্রমে পাচ্ছিস।'

'কী?'

'এই কিলচড়, নাকে খৎ, চাঁটি।'

'হুঁ, তো কী?'

'বলেছিলাম কি তার জন্যে প্র্যাকটিস করার দরকার কী?'

দিলু কিছুক্ষণ ভাবল। তাকে বেশ খানিকটা চিন্তাযুক্ত মনে হলো। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সে বলল, 'কথাটা তুই মন্দ বলিস নি। কিন্তু একবার প্রোগ্রাম করে ফেলেছি, এখন বদলানো ঠিক হবে না। তা ছাড়া এইসব করার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

এই বলে সে গা ঝাড়া দিল। বলল, 'তাহলে তোরা কিছুক্ষণ বস। আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে কেঁদে যাব। একটুও শব্দ হবে না। চোখ দিয়ে অনবরত পানি বেরোতে থাকবে। দ্যাখ ...'

দিলু কাঁদতে লাগল। দুপাটি ঠোঁট দেখতে না দেখতে কুঁচকে-মুচকে গেল। চোখের পানিতে গাল, নাক, ঠোঁট ভিজে গেল। গজা উসখুস করছে। তার ধারণা, যাহোক তা হোক—এসব ব্যাপারের ভেতর না যাওয়াই মঙ্গল। সে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'চল, পালাই আতিক।'

'পালাবি কী রকম? দেখলি না দিলু দরজার শেকল তুলে দিয়ে ভেতর থেকে এল।'

'তাই তো, কী করা যায়?'

গজা উসখুস করতে লাগল। বলতে কি, খারাপ আমারও লাগছিল। কিন্তু একবার ঘরের ভেতর সেঁটে গেছি, দিলুর প্র্যাকটিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা ছাড়া উপায় কী?

এই সময় একটা ব্যাপার ঘটল। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের দেয়াল ঘেঁষে। দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল। এক সময় জানালার দিকে চোখ পড়ল। চমকে উঠলাম আমি ও গজা দুজনেই। জানালার নিচে একটা বেল গাছের চারা। সেই চারা গাছটার কাছেই চারদিক গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন দিলুর চাচা, ওর বড় ভাই আর আমাদের গজার মামা, মানে স্বয়ং হেডমাস্টার সাহেব। দেখেই চক্ষুস্থির। গজা কাতর হয়ে বলল, 'আর রক্ষে নেই। মামা নির্ঘাত আমাকে।'

এই সময় নিচে হো হো হাসির রব উঠল। হেডমাস্টার সাহেব কি একটা গল্প বলছেন আর সবাই হাসছেন।

গজা তাড়াতাড়ি দুপা এগিয়ে মর্মান্তিক গলায় দিলুকে বলল, 'ভাই দিলু, এখনো সময় আছে। বাইরের শেকলটা খুলে দিয়ে আয়।'

দিলু জবাব দিল না। তার চোখ দিয়ে আরো বেশি পানি বেরোচ্ছে।

'সবই হলো বয়েস ... বুঝলেন না?'

হেডমাস্টার সাহেব গল্পটা শেষ করে মন্তব্য ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন দিলুর চাচা।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'দেখুন না কেন আমার ভাগ্নে গজাকে। একবার মোটে বলে দিয়েছি। ব্যস, সেই থেকে দুপুরবেলা আর বেরোয় না।'

'তাহলে কী করে?'

দিলুর বড় ভাইয়ের প্রশ্ন।

'অংক। অংক করে।'

হেডমাস্টার সাহেব এক গাল হাসলেন।

সব কথাই গজার কানে গেল। সে আর টুঁ শব্দ না করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। গম্ভীরভাবে বলে, 'আর কী? হয়ে তো গেলই। এইবার প্র্যাকটিস চালাই।'

গজা যা অনুমান করেছিল তা মোটেই অবান্তর না। দেখা গেল কথা বলতে বলতে ওঁরা এগিয়ে আসছেন ঘরের দিকে। একবার হেডমাস্টার সাহেব বলার চেষ্টা করলেন, 'তাহলে কথা যা ছিল তো বলেই গেলাম। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবেন। ইতিহাস-ভূগোলে যাতে ও ভাল করে তার জন্যে আমি বিশেষ যত্ন নেব। এখন আসি ...'

'সে কি হয় ...' দিলুর চাচা মাথা নাড়লেন। হাসলেন। 'গরিবের বাড়িতে যখন দয়া করে এসেছেন তখন একটু বসে না গেলে গরিবের ইজ্জত থাকে না।'

হেডমাস্টার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'গরিবের দেখি ইজ্জতও আছে। কিন্তু ওসব মুখের কথায় শুধু চলবে না বলে দিচ্ছি। বসব তো এক ভোল মুড়ি,

নারকেল-সন্দেশ দিয়ে বেশ মাখিয়ে ... বুঝলেন তো,— বেশ মাখিয়ে নিয়ে আসুন—হ্যাঁ! ওই হলো আমার বসার নিয়ম।'

চাচা বললেন, 'আমাদের বাড়ির নিয়ম আছে কারোর সামনে এক পদ খাবার দেয়া চলবে না। নারকেল-সন্দেশের দানা মুড়ি আর দুটি বাটি ধোঁয়া ওঠা গরম দুধ।'

হেডমাস্টার সাহেব প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, 'মুখে মুখে আর বলবেন না। কাজে দেখান। বাঙালির ওই এক দোষ। শুধু কথা বলে।'

সবাই হেসে উঠলেন। একটু পরে শেকল খোলার শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলটা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল। গজা এতক্ষণ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওরা ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে সে বলতে শুরু করল, 'মামা, আমাদের দিলুর মাথা, মাথাটা।'

'মাথাটা?'

'হ্যাঁ, মাথাটা।'

গজা নিজের মাথা দেখিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'একদম ইয়ে হয়ে গেছে। শুধু কাঁদছে। কথা বলে না, শুধু কাঁদে!'

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকালেন। আমি অধোবদনে দাঁড়িয়ে। গজা এক পায়ে। আর দিলু কাঁদছে।

'কী হলো তোদের?' হেডমাস্টার সাহেব ভয়ানক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোরা সব এমন জবর-জং হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, কী হয়েছে?'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'দিলু পরীক্ষায় ফেল করেছে কিনা। তাই রোজ নিয়ম ধরে।'

'কী?'

ঢোক গিলে বললাম, 'নিয়ম ধরে কাঁদে!'

'হুঁ!'

সবাই গম্ভীর হয়ে গেল।

তাই আমরা ওকে দেখতে এসেছিলাম।

গজা এবার হু হু করে কেঁদে ফেলে। বলে, 'এজন্যেই আমরা।'

হুঙ্কার ছাড়লেন হেডমাস্টার সাহেব, 'নিয়ম ধরে কাঁদলে বুঝি পরীক্ষা পাস করা যায়, এই গাধা, গিয়ে ধরলেন দিলুকে, 'কান্না থামা বলছি।'

দিলু তেমনি নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কিন্তু আমি যে ঠিক করেছি আরো পাঁচ মিনিট কাঁদব!'

গজা ততক্ষণে কান্না থামিয়ে শান্ত, সুস্থির। সে ব্যাকুল হয়ে দিলুকে অনুরোধ জানায়, 'দ্যাখো না, ভাই, কোন রকমে না কেঁদে পারা যায় কী না!'

হেডমাস্টার সাহেবের বিপুল গোঁফজোড়ার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্যে একচিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তিনি তাকালেন দিলুর চাচার দিকে। দিলুর চাচা বললেন—খোকা, আর কাঁদতে হবে না। হেডমাস্টার সাহেব তোকে

প্রমোশন দিয়েছেন। এ বছর ভাল করে পড়াশোনা কর তাহলে তিনি আর তোকে বকবেন না।

এক মুহূর্তের জন্যে দিলু থামল।

গজা কেন যেন মহাখুশি। আমি থ'।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন—চলুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। গজা ...

'জি ...'

'খুব পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস বুঝি! অংক করেছিলি?'

গজা বলল 'জি না! খুব অসুবিধা থাকায় করতে পারি নি।'

'পারো নি? পারো নি? আচ্ছা।'

হেডমাস্টার সাহেব চোখ পাকিয়ে দলবলসহ ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দা থেকে ওঁরা ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে বসলেন।

ততক্ষণে দিলুর রুটিন বাঁধা সময় চলে গেছে। চোখ-মুখ মুছে দিলু বলল, 'যাক তাহলে পাস করেছি। রুটিনটা পাল্টিয়ে নতুন নিয়ম করতে হবে।'

বলে রুটিনটা ছিঁড়তে যাচ্ছিল। কাতরভাবে বাধা দিল গজা। হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, 'আহা করিস কী? রুটিনে তোর প্রয়োজন ফুরাতে পারে কিন্তু আমার আছে। আমি এটা নিয়ে গেলাম।'

গজা কাঁদো কাঁদো মুখে বাড়ির দিকে চলল। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিলু বলল, 'চল গজাকে বাঁচিয়ে দিয়ে আসি। ও ঠিক বেঁচে যাবে।'

'কীভাবে?'

'সেটা পরে শুনিস।'

চার

কিছুক্ষণ পর আমি আর দিলু গজার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি গজা তার ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। আমাদের দেখতে পেয়ে সে পায়চারি থামাল। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে কথা বলতে মানা করল। তারপর আস্তে দরজা খুলে দিল। বলল, 'কেন মরতে এলি, ভাই?'

'তোকে বাঁচাতে এলাম।'

দিলু গম্ভীর হয়ে বলল। তার হাতে দুটো কাগজের বাক্স, আমার হাতে একটি।

গজা বলল, 'বাঁচাবার কোন উপায় নেই। মামা হলেও একটা কথা ছিল। তেমন অসুবিধেয় পড়লে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিই। কিছুক্ষণের ভেতর পার পেয়ে যাই। কিন্তু মামার সময় কম বলে আমাদের পড়াবার ভার পড়েছে ভাইয়ার ওপর। ভাইয়াকে জানিস তো?'

'হ্যাঁ,' আমরা দুজনেই মাথা নাড়ি।

গজার ভাইকে আমরা ভালরকমই জেনেছি বলতে হবে। একবার গজাকে ডাকতে গিয়ে আমি আর দিলু পড়ে গেলাম ভাইয়ার খপ্পরে। প্রথমে আমাদের দেখে এমন মিষ্টি একখানা হাসি ছাড়লেন যে আমরা একেবারে বিগলিত। আমাদের ডেকে পাশে বসালেন। বললেন, 'তোমরা তাহলে গজুর বন্ধু? তোমাদের নাম কী?'

দিলু বলল, 'আমি হলাম দিলু আর ও আতিক।'

'বেশ, বেশ ... খুব ভাল নাম তোমাদের।'

ভাইয়া আমার আর দিলুর কাঁধে দুটো আদরের থাপ্পড় ঝাড়লেন। তিনি বোধহয় আদরই করলেন। কিন্তু আদরের মাত্রাটা এমন প্রচণ্ড হলো যে থাপ্পড়ের চোটে আমাদের পিঠ বেঁকে যাবার জোগাড়।

'লেগেছে নাকি?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

দিলু ভদ্রতা করে বলল, 'না, না, এমন কিছু নয়।'

'বেশ, বেশ, এই তো চাই', তিনি স্নেহের সঙ্গে দিলুর পিঠে দুআঙ্গুলের একটা মোচড় দিলেন।

'কেমন?'

তিনি প্রশ্ন করেন, 'এখন কেমন লেগেছে ...'

দিলু কড়া মোচড় খেয়ে মর্মাহত। সে বলে, 'এখন বেশ লেগেছে।'

'লাগারই কথা ...'

ভাইয়া উদাসভাবে বলেন, 'এটার নাম হলো আঁতে ঘা। যাক গে।'

তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দিলুকে ছেড়ে দিয়ে গজার দিকে তাকান। দুটো টাকা দিয়ে বলেন, 'জল্‌দি কিছু কড়া পাকের সন্দেশ নিয়ে আয় তো।'

লোকটা বেশ মজার তো! আমরা ভাবি। এই কাণ্ডের পর তিনি তাহলে আমাদের কড়া পাকের সন্দেহ খাইয়ে ছাড়বেন। আমরা ভাইয়ার থাপ্পড় আর মোচড়ের কথা ভুলে যাই। সন্দেশের নামে আমাদের জিভে পানি আসছিল। আমরা অধীরভাবে সন্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর প্রায় আধ মাইল রাস্তা ভেঙে স্টেশনরোড থেকে কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে আসে গজা।

ভাইয়া বলেন, 'এনেছিস? বেশ, বেশ।'

ঠোঙা থেকে একটার পর একটা সন্দেশ তুলে মুখে পুরতে থাকেন ভাইয়া। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। যখন একটা মোটে সন্দেশ বাকি আছে, তখন তিনি মিষ্টি হেসে স্নেহের গলায় বলেন, 'গজু।'

'জি?'

'খেতে খুব ইচ্ছে করছে, না? ঠিক আছে আর একদিন তোদের খাওয়াব।'

গজা মর্মাহত হয়ে বলে, 'আপনি তো এরকম রোজই বলেন, ভাইয়া।'

এই হলো ভাইয়া। থাকেন লাহোর, চাকরি করেন। লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। সরু কাঠির মতো চেহারা। যেমন লম্বা, তেমন রোগা। খাড়া নাকের

নিচে বাজখাঁই ধরনের গোঁফ রেখেছেন। গোঁফে অনবরত তা দিয়ে চলেছেন তিনি আর অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভেবে চলেছেন।

'দেখার মতো চেহারাই বটে।'

আমরা স্বীকার করি। দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের মিল নেই। চেহারার সঙ্গে গোঁফের মিল নেই। কিন্তু তা হোক। কিছুতে কিছু মিল না থাকলেও তিনি গজার ভাইয়া। এই একটু বাদেই তিনি গজাকে অংক করাতে আসছেন।

'চেহারা দেখে ভুল করা স্বাভাবিক'—গজা বোঝাতে বসল, 'কিন্তু চেহারা দেখে ভাইয়াকে বোঝা যায় না। তার হাতের থাবার ওজন হবে সাড়ে পাঁচ সের। সেই থাবা যখন গায়ে এসে পড়ে, তখন?'

'আর বলতে হবে না।' দিলু থামিয়ে দিল। বলল, 'নে এখন যা বলি ঝট্‌পট্ করে ফেল্।

গজা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দিলু বলল, 'তোর ভাইয়া ঠিক কোন্ জায়গায় বসেন বল তো।'

'জানালার কাছ ঘেঁষে চেয়ারটায়। এখানে বসাটা খুব সুবিধাজনক। হাত বাড়ালেই আমার চুল, কান, নাক সহজেই পাওয়া যায়। বুঝলি না?'

'তাহলে সুবিধেই হলো ...'

দিলু কাগজের বাক্স ক'টার দিকে তাকিয়ে হিসাব করতে বসে। বাক্স ক'টার দিকে আগেই চোখ পড়েছিল গজার। এইবার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, 'এগুলো কী রে?'

দিলু তখন চেয়ার থেকে জানালার দূরত্ব, দেয়াল থেকে টেবিলের পায়ার দূরত্ব মাপছে। সে জবাব দিল না। আমি জবাব দিলাম। বললাম, 'বাক্সগুলোর উপরে লেখা আছে। পড়ে দেখ না ...'

মোট বাক্সের সংখ্যা তিন। প্রতিটা বাক্সের উপর কাগজ আঁটা। সেই কাগজে ছোট ছোট হরফে কতকগুলি নাম লেখা আছে। যেমন প্রথম বাক্সটার উপর লেখা : 'ডাল কুত্তা'। দ্বিতীয় বাক্সটার উপর লেখা : 'অটোমেটিক পিস্তল'। তৃতীয়টির উপর লেখা : 'বানর সেনা'।

গজা পড়ল। হাঁ করে রইল। বলল, 'কী রে? এসব কী?'

'প্রশ্ন করিস না।'

দিলু আদেশ দিল, 'যা বলছি উত্তর দে।'

'বল্।'

'তোর ভাইয়া প্রথমে এসে কী করেন?'

গজা একটু ভেবে বলল, "প্রথমে এসে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে অনুমানিক দশ মিনিট আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে গোঁফে তা দিয়ে চলেন। যখন বোঝেন, আমি তাঁর চোখের কড়া নজর সহ্য করতে না পেরে দুর্বল হয়ে বেবাক পড়া ভুলে গেছি, তখন তিনি পড়া জিজ্ঞেস করেন। পড়া বলতে না পারলে তিনি কিছুক্ষণ মৃদু মৃদু হাসেন। তারপর তাঁর কাজ শুরু করেন।"

'প্রথমে তিনি হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধরেন ও পিঠে দমাদম কিল বসান। কিলের পর কান ধরেন। কান ছেড়ে তিনি চামড়ায় টান মারা শুরু করেন। এইটিই তাঁর খুব প্রিয়। প্রায়ই দেখা যায়, চামড়ায় টান বসাতে পারলে কাউকে সহজে তিনি ছাড়েন না।'

'ব্যস, ব্যস!'

দিলু থামিয়ে দিল। বলল, 'তোর ভাইয়া খালি গায়ে আসেন না জামা গায়ে দিয়ে আসেন?'

'তার কিছু ঠিক নেই। খালি গায়েও আসেন, জামা বা গেঞ্জি গায়ে দিয়েও আসেন।'

দিলু আর কথা বাড়ায় না। তার কাজ শুরু করে দেয়। 'ডাল কুত্তা'র বাক্সটা সে রাখল দেয়ালের সাথে মিশিয়ে, চেয়ারের পায়ার আড়ালে। 'বানর-সেনা'র বাক্সটা রাখা হলো চেয়ারের পাটাতনের নিচে। তৃতীয় বাক্সটা অর্থাৎ অটোমেটিক পিস্তলের বাক্সটা দিলু আমাকে হাতে রাখতে বলল, 'যখন বলি তখন কাজ শুরু করবি।'

একটু ভেবে বলল, 'তবে মনে হচ্ছে দুটোতেই হয়ে যাবে। দেখা যাক।'

গজার কৌতূহল তখনো যায় নি। সে বলল, 'ওগুলো কিসের বাক্স বললি না?'

'যথাসময়ে বুঝবি ...'

দিলু গম্ভীর, 'চিন্তা করিস না, তোমার ভাগেও কিছু কিছু পড়বে। তোকে জড়াবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কী করব। "অটোমেটিক পিস্তল"-এর ট্রেনিংটা ঠিকমত হয় নি।'

গজা এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝল না। আমি বললাম 'হাঁ করে আছিস কেন? তোকে বাঁচাবার জন্যে আমরা চেষ্টা করছি।'

ভেতরের বারান্দায় গজার ভাইয়ার গলাকাশি শোনা গেল। গজা ফিসফিস করে বলল, 'আসার সময় হয়েছে।'

দিলু লাফিয়ে জানালার ওপর উঠল। বলল, 'আমরা দুজন নিচে থাকলাম।'

দিলু ও আমি জানালার নিচে লাফিয়ে পড়লাম। এখন আর আমাদের হাতে বাক্স নেই। আছে তিন ত্রিক্কে ন'টি সুতোর প্রান্ত। দিলু কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সাবধান কিন্তু।'

চারদিকে তাকালাম। ভয়ের অনেক কিছু আছে বৈকি। তবু রক্ষা আমাদের আশপাশে উঁচু পাতাবাহারের ঝাড়। দিব্যি গা লুকিয়ে থাকা চলে। আমরা তখন উত্তেজনায় অধীর। কান সজাগ। অপেক্ষা করছি কখন গজার ঘরে ভাইয়া এসে ঢুকবেন।

অবশেষে তিনি এলেন। তাঁর আসার শব্দ পেলাম। চেয়ারটা মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। তিনি জুতো খুলে বসেছেন তাও টের পেলাম।

অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। বুঝলাম তিনি এখন ক্রমাগত গোঁফে তা দিচ্ছেন আর একদৃষ্টে গজার দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি মুখ খুললেন।

'গজা।'

'জি।'

'কই, অংক দে।'

গজা বোধ হয় অংকের খাতা বাড়িয়ে দিল। দিলু তার হাতের একটা সুতো টান দিল। বুঝলাম 'ডাল কুত্তা'র বাক্সের মুখ খুলে গেছে।

'তোর অংক হয় নি।'

ভাইয়া খুব যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সামান্য একটা ডেসিমেল তোকে দিয়ে হলো না।'

হঠাৎ ভাইয়া 'উ' করে উঠলেন।

গজা বলল, 'কী হয়েছে, ভাইয়া—'

ভাইয়া সামলে নিয়েছেন। খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিছু না। নে, এদিকে দেখ ...'

বলতে না বলতে তাঁর গলায় হেঁচকি উঠল। তখন দিলু তিনটা সুতো ঢিলে করে দিয়েছে। অর্থাৎ 'বানর সেনা'ও বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। 'উফ' 'উফ' করতে লাগলেন ভাইয়া। কাতর গলায় বললেন, 'গজুরে ...'

'জি, ভাইয়া?'

'উফ!' ভাইয়া জবাব ছাড়লেন।

'কী হলো, ভাইয়া ...'

'শেষ হয়ে গেলাম রে, গজু ... উফ ... আমাকে খেয়ে ফেলল রে ...'

একটা সোরগোল পড়ল। ভাইয়া কখনো গেঞ্জির ভেতরে হাত দিচ্ছেন, কখনো পায়ের পাতায়, কখনো পিঠে ... আর ক্রমাগত 'উফ' 'উফ' আর্তনাদ করছেন!

দিলু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'পিস্তলের বাক্সটার ডাল খুলে দে ... দুটোর বেশি ছাড়বি না ...'

আমি সুতো ছেড়ে দিলাম। 'ডাল কুত্তা'র বাক্সে আছে দিলুর ভাষায় ভাল জাতের হৃষ্টপুষ্ট হাঙ্গেরিয়ান ছারপোকা। ছারপোকাগুলি সুতো বেয়ে বেয়ে ভাইয়ার শরীরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। এখন আক্রমণ চালাচ্ছে। 'বানর সেনা'র বাক্সে আছে ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে। দিলুর কথায় ওগুলোর কামড় খেলে নাকি মনে হয় তামাদি হয়ে গেলাম। সর্বশেষ যেটি ছাড়া হলো অর্থাৎ 'অটোমেটিক পিস্তল'—সেটি হলো বোলতা। এতক্ষণ 'ডাল কুত্তা' আর 'বানর সেনা'র আক্রমণে ভাইয়া প্যাঁচপ্যাঁচে গলায় 'উফ', 'উফ'; করছিলেন, আর রেগেমেগে ক্রমাগত দুই হাতে শরীর সামলাচ্ছিলেন। বোলতার একটা কামড় খেয়ে আর বাধা মানলেন না। 'ভেউ' করে কেঁদে ফেললেন। চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, 'গজুরে, ভাই, আমি আর বাঁচব না ...'

'কী হলো, ভাইয়া' বলে গজু এগোতে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় বোলতাটা বোধহয় তারই নাকে হুল বসাল। আনুনাসিক স্বরে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল গজা। ভাইয়ার 'উফ' 'উফ' আর গজার 'হিঁঃ হিঁঃ' কান্নায় সারা বাড়িতে রোল পড়ল।

দিলু ফিসফিস করে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, আতিক। এটা করা ঠিক হয় নি। চল্, এবার পালাই।'

আমাকে তখন মজায় পেয়েছে। বললাম, 'এখনি কী। দাঁড়া বেগতিক দেখলে ভোঁ দৌড় দেব।'

চিৎকার শুনে হেডমাস্টার সাহেব ও তাঁর স্ত্রী ছুটে এসেছেন। তাঁরা তো অবাক। কী হলো আবার?

'এই যে, শফি [ভাইয়ার নাম তাহলে শফি!] কী হয়েছে তোমাদের ... চেঁচাচ্ছ কেন?'

'আমি "ফিনিশ" হয়ে গেছি, বাবা,' শফি ভাইয়া কাৎরাতে কাৎরাতে বললেন, 'ডেসিমেল করাচ্ছিলাম গজুকে। গজুও "ফিনিশ"।'

বয়স্ক ছেলের এই অবস্থা দেখে হেডমাস্টার সাহের রীতিমতো বিস্মিত। সব তাঁর তালগোল পাকিয়ে যায়। বলেন, 'কী বলছ, শফি? তুমি বলতে চাও ডেসিমেল অংক করলে মানুষ ওরকম "ফিনিশ" হয়ে যায়!'

শফি ভাইয়া বিকট হাঁক ছেড়ে বললেন, "ফিনিশ" হয়ে যায় মানে? এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লাল পিঁপড়ে, ছারপোকা আর ...'

বলেই ভাইয়া 'শরীর জ্বলে যাচ্ছে, উঃ, আমি আর বাঁচব না,' বলতে লাগলেন এবং শরীরের চারদিকে খামচাতে লাগলেন।

'পিঁপড়ে, ছারপোকা।'

হেডমাস্টার সাহেব কিছুতেই কিছু বুঝতে পারেন না।

ভাইয়া বলতে থাকেন, 'আর বোলতা! পিঁপড়ে, ছারপোকা, আর বোলতা। উফ! মরে গেলাম!'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না, শফি ...'

হেডমাস্টার সাহেব এগিয়ে আসেন। বলেন, 'তুমি তো বাপু সামান্য কিছু একটা হলেই সোরগোল পাকিয়ে বসো। কথার খই ফোটে মুখে। সংক্ষেপে বলো তোমার কী হয়েছে ...'

এই সময় নতুন একটা বোলতা উড়ে গিয়ে বসল ভাইয়ার কানের নরম জায়গায়। কামড় বসিয়ে দিল। ভাইয়া ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, 'সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয় আমি মারা পড়েছি। ওরে বাপরে ...'

ভাইয়া বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে আর গেঞ্জি তুলে দুহাতে পিঠ, পা খামচাতে লাগলেন।

হেডমাস্টার সাহেব কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে তিনি ভাইয়ার অস্বাভাবিক চিৎকার ও কান্না শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত বলে ভাবলেন। তিনি গম্ভীর গলা বললেন, 'তোমার ঠিক কী হয়েছে আমি জানি না, শফি, কিন্তু

তুমি যে অত্যন্ত বিচলিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। শফি, তুমি না একজন গ্রাজুয়েট? সেই বিখ্যাত কবিতাটা কি পড়ো নি, "ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক," নাহ্।'

হেডমাস্টার সাহেব খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ভাল বইপত্র তুমি কোনোদিনই পড়লে না! চলো, তোমাকে এক্ষুণি আমি মহাকবি মিল্টনের "প্যারাডাইস লস্ট" বইখানা পড়ে শোনাচ্ছি ...'

প্যারাডাইস লস্ট পড়তে হবে শুনে ভাইয়ার কান্না দ্বিগুণ বাড়ল। তারপর 'সা' থেকে গলার স্বর মুহূর্তেই চলে যায় খাদের পা'র দিকে। তেমনি বুক-হাত ও পিঠ খামচাতে খামচাতে ভাইয়া বলে, 'কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট আমি পড়ব কখন শুনি। এদিকে যে আমার লাইফ লস্ট হবার জোগাড়। আমি, এ্যাঁ এ্যাঁ।'

ভাইয়া কাঁদতে থাকে, 'আমি ফিনিশ হয়ে গেছি। গজু ডেসিমেল করছিল, গজুও ফিনিশ।'

মামীমা এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। লাল পিঁপড়ের দু-একটা তখন এদিকে এসেছে। তিনি মলম নিয়ে এসে ভাইয়ার সারা গায়ে মাখিয়ে দেন। গজার নাকেও মলম দেওয়া হলো।

মামীমা বলেন, 'পিঁপড়ে কামড়েছে, চেঁচানো শুনলে মনে হবে বাঘে ধরেছে। ভীতু আর কাকে বলে!'

ঠিক এই সময় পাতাবাহারের ঝোপ থেকে আমরা সটকে পড়তে যাচ্ছিলাম। কীভাবে যেন পায়ের নিচে একটা শুকনো ডাল পড়ে মড়মড় শব্দ উঠল। হেডমাস্টার সাহেব শব্দটা শুনে তক্ষুণি জানালার কাছে সরে আসেন। বাজখাঁই গলায় বলেন, 'কে ওখানে? কে?'

আমি পালাতে যাচ্ছিলাম দৌড়ে। দিলুর জন্যে পারা গেল না। সে অপরাধীর মতো মাথা তুলে বলল, 'আমরা, স্যার। দিলু আর আতিক!'

'বটে ...' হেডমাস্টার সাহেব হুঙ্কার ছাড়েন, 'এদিকে উঠে আয় বলছি, উঠে আয়।'

কী আর করি। ঘরের ভেতর এলাম। দিলু বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার, এসব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। আমাকে শাস্তি দিন।'

ঘটনার রহস্য খুলে বলা হলো। হেডমাস্টার সাহেব গম্ভীর গলায় বলেন, 'এসব ফন্দি কার?'

'আমার, স্যার।'

দিলু জবাব দিল, 'গজা আর আতিকের কোনো দোষ নেই। ওরা মাত্র আমার সঙ্গে ছিল।'

'হু।'

হেডমাস্টার সাহেব মাথা নাড়েন, 'দিলু, তুমি ভয়ানক অন্যায় করেছ। গজা আর আতিকের দশটা করে বেত আর তোমার কুড়িটা।'

আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে দিলুকে বলল, 'আর আমি তোমাকে যতক্ষণ খুশি খড়ম দিয়ে পিটব। তুমি কিছু বলতে পারবে না, বাবা!'

'আঃ—'

হেডমাস্টার সাহেব শফি ভাইয়াকে নিরস্ত করতে যান। বলেন, 'শাস্তি তো দিচ্ছিই।'

হঠাৎ তিনি দিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু তুমি এসব বলতে গেলে কেন? ইচ্ছে করলেই তোমরা পালিয়ে যেতে পারতে।'

দিলু বলল, 'ভাইয়ার যা দশা হয়েছে তাতে খারাপ লাগছে আমার। তাই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে নি। বুঝেছি অন্যায় করেছি আমরা।'

ভাইয়া আস্ফালন করে উঠলেন, 'ওইসব ভাল কথায় চিঁড়ে ভিজবে না ছোঁড়া। তোমাকে বেঁধে যতক্ষণ খুশি মারব। ইঃ, আর একটু হলেই কামড়ের চোটে হার্ট ফেল হয়ে যেত।'

হেডমাস্টার হাসি চাপলেন। শফিকে তিনি আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। এবার শুরু হলো গজার মামীমা অর্থাৎ হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রীর ভূমিকা। তিনি এতক্ষণ প্রায় নির্বাক হয়ে সবকিছু দেখছিলেন। এইবার তিনি এগিয়ে এসে হাত ধরলেন আমাদের। বললেন, 'ইস, বেত মারবেন উনি এইসব কচি কচি ছেলেদের। মারলেই হলো! আয় দেখি তোরা ...'

গজার কান্না কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল। এইবার সুযোগ পেয়ে সে ভোঁস করে শিশু মাছের মতো কেঁদে দিল। বলল, 'আবার ভাইয়া বলেছেন বেত মারা হয়ে গেলে তিনি যতক্ষণ খুশি আমাদের খড়মপেটা করবেন।'

'আয় না তোরা! কে তোদের মারে দেখছি।'

মামীমা আমাদের সবাইকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

হেডমাস্টার সাহেব ও শফি ভাইয়া এই সময় ফিরে এলেন। শফি ভাইয়া মনমরা হয়ে দিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই আমার কাছে মাফ চা, দিলু। কথা দে, আর কখনো এ রকম করবি না।'

আমরা তো আনন্দে ডগমগ। যাক তাহলে বেতের ফাঁড়াটা ভালয় ভালয় কেটে গেল। কিন্তু দিলু আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আমাকে শাস্তি দিন। ভাইয়ার কুড়িটা বেতের বাড়ি আমি সহ্য করতে পারব।'

'তাহলে আর কী ...'

ভাইয়া বেশ খুশি খুশি। হেডমাস্টার সাহেবের দিকে তাকালেন'। বললেন, 'দেখলে তো, বাবা, এ মাফ চায় না। শাস্তি চায়। তাহলে মাঝারি গোছের কুড়িটা বেতের বাড়ি দিয়েই দি।'

মামীমা বললেন, 'তুইও বাপু কম নস ... ছেলেমানুষ একটা দুষ্টুমি করে ফেলেছে ... লজ্জা পেয়েছে তাই মাফ চাইতে পারছে না ... তুই নিজে মাফ করে দে না।'

কাতর হয়ে ভাইয়া তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আচ্ছা, দিলু, তুমি যাও। ভবিষ্যতে এরকম কোরো না। তুমি খুবই অন্যায় করেছ। গজা ... তুই কাল থেকে চোদ্দটা করে অংক করবি। করে দেখাবি। না পারলে ...'

ভাইয়া ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়লেন। গজা শুধু সায় দিল মাথা ঝাঁকিয়ে আর কাঁদো কাঁদো হয়ে ঢোক গিলল।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'দিলু, তোমরা এখন যাও। কাল আমার সঙ্গে তোমরা তিনজন স্কুলে দেখা করবে।'

আমরা চলে আসছিলাম। মামীমা আমাদের হাত ধরলেন। রাগ করে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস শুনি? বললাম না দুপুরে পুলি পিঠে করেছি? ওঃ, দুষ্টু হয়েছ সব ... কথা কানে যায় না?'

আসলে মামীমা পিঠের কথা একবারও বলেন নি। কিন্তু আমরা এমন ভাব দেখালাম, যেন কথাটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে আমি বললাম, 'মাফ করে দিন, মামীমা ... এ রকম আর করব না।'

পাঁচ

গরমের ছুটির আর সপ্তাহখানেক বাকি আছে। একদিন সকাল বেলায় হেডমাস্টার সাহেব আমাকে আর দিলুকে ডেকে পাঠালেন। আমরা তাজ্জব। সকাল বেলা হেডমাস্টার সাহেব তলব করে পাঠিয়েছেন। কী ব্যাপার! আমরা দুজন খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি হেডমাস্টার সাহেব বসার ঘরে গুম হয়ে বসে আছেন। মামীমা চোখের পানি মুছছেন।

'বসো।' হেডমাস্টার সাহেব শান্তভাবে আমাদের বসতে বললেন। আমরা বসলাম।

আমাদের দেখে মামীমার চোখের পানি আরো উথলে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন 'তুমি তো কিছুতেই গা করো না। আমি বলছি এ নিশ্চয়ই ছেলেধরাদের কাজ! আহারে, আমার মাসুম ছেলেটা ...'

'মাসুম কী বলছ ...'

হেডমাস্টার সাহেব আস্তে আস্তে বলেন, 'রীতিমতো বারো তেরো বছরের ছেলে ... না, না ... এ নিশ্চয়ই ...'

দিলু বলল, 'কী হয়েছে, স্যার ... আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। ...'

'গজা কাল রাত এগারোটায় বাড়ি থেকে পালিয়েছে ...'

হেডমাস্টার সাহেব জানান। তাঁর চোখ-মুখ আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'পালিয়েছে না কারো পাল্লায় পড়েছে কে জানে ...' মামীমার গলার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ পায়।

আমরা দুজন তাজ্জব। গজা পালিয়েছে, কাল রাত্রি থেকে নিখোঁজ ... কী ভয়ানক ব্যাপার! বলতে কী কথাটা শুনেই নানা ভাবনা ও আশঙ্কায় আমাদের গলা শুকিয়ে যায়।

হেডমাস্টার সাহেব বলেন, 'আমার যদ্দূর বিশ্বাস গজা পালিয়েছে। যাই হোক, ওর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাচ্ছি না। তোমরা বাবা এদিক-ওদিক একটু খোঁজ করে দেখো, কেমন?'

আমরা মাথা নাড়লাম। দিলু বলল, 'আমরা, স্যার, আজ থেকেই খুঁজতে শুরু করব।'

একটু থেমে লজ্জিত হয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনারা চিন্তা করবেন না ... যেভাবেই হোক ...'

হেডমাস্টার সাহেব একটু হেসে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা গজার বন্ধু। তোমরা খোঁজ করলে নিশ্চয়ই সন্ধান পাবে। ওর দেখা পেলে বলো আমরা ওকে কিচ্ছু বলব না। ও যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।'

একরাশ উত্তেজনা বুকে নিয়ে আমরা হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরলাম। কথাটা শোনার পর থেকে দিলু ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়েছে। স্কুলে গিয়ে কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না। এদিকে গজার খবরটা আমি সারা স্কুলে রাষ্ট্র করে দিয়েছি। ছেলেদের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিকাল বেলা মাঠে গিয়েছি খেলতে। খেলা জমল না। হঠাৎ নবম শ্রেণীর ছাত্র আকবর বলে বসল, 'আজ আর খেলা না। এসো গজার ব্যাপারটা নিয়ে কী করা যাই সবাই একটু আলাপ-আলোচনা করে দেখি।'

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। ছত্রভঙ্গ খেলোয়াড়রা ফুটবল রেখে এক জায়গায় জমায়েত হলো। একজন বলে বসল, মিটিং হোক। সঙ্গে সঙ্গে তো ভোটে পাস হয়ে গেল। আর পাশ ফিরতে না ফিরতে তাকিয়ে দেখি আকবর গদগদ গলায় সভাপতি হিসেবে দিলুর নাম প্রস্তাব করে বসেছে।

সবাই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেই প্রস্তাব সমর্থন করল।

দিলু ভারী গলায় বলল, 'সভার কাজ শুরু হোক।'

সভার কাজ শুরু হলো। প্রথমেই বলতে বলা হলো অতি উৎসাহী আকবরকে। সে বলল, 'গজা আমাদের স্কুলের ছাত্র। সে আমাদের বন্ধু। তার বিপদ আমাদের সকলের বিপদ। আমাদের কর্তব্য গজার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা। এই কমিটির নাম হবে "দি গজা অনুসন্ধান কমিটি"। তোমরা কী বলো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ...'

সুনির্মল চেঁচিয়ে উঠল, 'গজাকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে। দরকার হলে গজাকে আমরা গরুখোঁজা খুঁজব।'

এই বিষয়ের ওপর প্রায় সবাই বক্তৃতা দিল। কারো উৎসাহ কম না। কেউ সন্দেহ করল গজার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর একটা রহস্যের জাল। কেউ বলল গজার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে আছে একটা ভীষণ চক্রান্তের বেড়া। গরম গরম বক্তৃতা হওয়ার পর এল সভাপতির পালা। সভাপতি দিলু শান্তশিষ্ট, চুপচাপ। অতি উৎসাহী আকবর ফিসফিস করে বলল, 'এই দিলু, তুই এবার সভাপতির ভাষণ দে ...'

'দাঁড়াও, ভাই ...' দিলু পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'একজনকে পাঠিয়েছি ... এক মিনিট অপেক্ষা করো ... সে আগে আসুক ...'

সবাই অবাক। কী ব্যাপার ... কাকে পাঠিয়েছে দিলু? কে ফিরে আসবে!

দিলু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে দেখি ক্লাশ ফাইভের ছাত্র প্রদীপ দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। সে এসে কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস দিলুর হাতে দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি যেখানটার কথা বলেছিলে সেখানেই পেয়েছি।'

আমরা সবাই হাঁ করে আছি। আকবর তো ফস করে বলেই বসল, 'কাগজে মোড়া ওই জিনিসটা কী রে, দিলু ...'

দিলু সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাশভারী গলায় বলল, 'গজার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ আমরা পেয়েছি। তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করেছি। এই উদ্দেশ্যে "দি গজা অনুসন্ধান কমিটি" গঠন করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে সকলের মতামত জানা দরকার।'

'মতামত আবার কী?'

আকবর হৈ হৈ করে উঠল, 'আমরা সবাই রাজি আছি, কী বলো তোমরা?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ...' চারদিক থেকে কলরব উঠল।

'তাহলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ...'

দিলু কাগজে মোড়া জিনিসটা খুলতে শুরু করল। বেরোল একখানা ক্ষুর আর একটি কাঁচি। দিলু গলা কাঁপিয়ে দরাজ গলায় বলল, 'আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব—আমরা যারা দি গজা অনুসন্ধান কমিটির মেম্বার, তারা সকলে গজার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ন্যাড়া হয়ে থাকব। আমরা এই মুহূর্ত থেকে প্রতিজ্ঞা করছি ...'

দিলুর গরম বক্তৃতায় মুহুর্মুহু করতালি পড়ল। তারপর শুরু হলো মাথা ন্যাড়া করার পালা। সকলের আগে মাথা ন্যাড়া করল দিলু। তারপর নিজের হাতে ক্ষুর নিয়ে আকবরকে বলল, 'এসো তুমি "দি গজা অনুসন্ধান কমিটি"র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তোমার মাথা ন্যাড়া করে দিই।'

আকবর প্রথমটায় হতবাক। তার মাথায় সুন্দর পরিপাটি করা কোঁকড়ানো চুল। দিলু উৎসাহ দেবার জন্য বলল, 'জলদি, আকবর ভাই, দেরি কোরো না ...'

আকবর কী করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ রেগে গেল। 'দাঁড়া না ... অত তাড়া দিচ্ছিস কেন? ইঃ, ভারি আমার ইয়ে হয়েছেন, খালি আছেন ফেরেববাজির মধ্যে!'

আকবর খিঁচিয়ে ওঠে।

'বাঃ, তুমি দেখছি মাথা ন্যাড়া করতে চাও না।'

দিলু ক্ষুণ্ন হয়ে বলল, 'এই তো আমিও মাথা ন্যাড়া করেছি ...'

'তোর মাথা আর আমার মাথা এক হলো? তোর মাথায় কতকগুলো শুকনো রোঁয়া আছে, চেঁছে বরং ভাল করেছিস। রোঁয়াগুলো থাকলে পাগলা পাগলা দেখায়, এখন দিব্যি সুস্থ-সমথ লাগছে ...'

আকবর খিঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু আর আপত্তি করে না। দিলুর ক্ষুরের নিচে আত্মসমর্পণ করে। একে একে সবাই মাথা ন্যাড়া করলাম, গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিলাম। তারপর যে যার বাড়ি ফিরলাম।

দি গজা অনুসন্ধান কমিটির কাজ পুরোদমে চলল। অবসর সময়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। শহর, শহরতলির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াই। দিলুর ধারণা গজাকে কেউ 'গুম' করে রেখেছে। আমি তর্কের খাতিরে বলেছিলাম, 'বাঃ, গজাকে গুম করে রেখে লাভ কী?'

'লাভ কী?'

দিলু মাথা নাড়ে। হঠাৎ আঙুল দিয়ে ফুটপাতের দিকে নির্দেশ করে। সেখানে হাত-পা নোলা একটা লোক চেঁচিয়ে ভিক্ষা করছে। দিলু বলে, 'ওই দেখ লোকটাকে। কে বলবে এই লোকটা গজার মতই সুস্থ মানুষ ছিল কি না।'

'বলিস কী রে!' আমি আঁতকে উঠি। মানস চোখে গজার হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারাটা ভেসে ওঠে। খোদা না করুন দিলুর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে উপায়?

দিলু বলল, 'উপায়ের কথা ভাবছিস? দাঁড়া না গজার জন্যে সারা দুনিয়ায় কী তোলপাড়টা করি দেখ! ভেবেছিস অত সহজে ছাড়ব।'

দিলুর ওপর আমাদের অনেক ভরসা। আমরা বিপদে পড়ে হা-হুতাশ করি, দিলু তা করে না। দিলু বুদ্ধি বার করে, বুদ্ধি যোগান দেয়। সত্যি কথা বলতে কি গজার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস, দিলু একটা না একটা হিল্লে করবেই।

কিন্তু দিলু কেমন যেন গম্ভীর চুপচাপ হয়ে গেছে। একদিন প্রদীপকে নিয়ে বিকালে দিলুদের বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি হাতে রবারের থাবা বেঁধে সামনে বালু ভর্তি থলের সাথে দিলু বক্সিং লড়ছে।

'কী ব্যাপার, দিলু ভাই।'

প্রদীপ কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

দিলু কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর বলল, 'আর তিনদিন পরে প্র্যাকটিস শেষ হবে। এখন বাকি আছে নাইফ থ্রোয়িংটা। ওটা হয়ে গেলেই ব্যস, কাজে নেমে পড়ব।'

'কী কাজ?'

'জানিস না?'

দিলু জানায়, 'গজার ব্যাপারে মোটামুটি একটা ক্লু পেয়ে গেছি।'

'সত্যি?'

'আমার তো তা-ই বিশ্বাস। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে গজা আছে তেরিপট্টির গুদাম ঘরের পেছনে। তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে ...'

'ঠিক বলছ, দিলু ভাই?'

প্রদীপ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

দিলু ধীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তো চলো, আমরা গিয়ে গজা ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে আসি।'

'আস্তে।' দিলু প্রদীপের উৎসাহে বাধা দিল। চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল। বলল, 'অত উৎসাহ ভাল না। সত্যি যদি গজাকে মুক্ত করে আনতে চাস, তাহলে আমার মত ক'দিন প্র্যাকটিস করে নে। কী, করবি প্র্যাকটিস?'

প্রদীপ ফস করে বলে বসে, 'করব।'

'ব্যস হয়ে গেল।' কথাটা শুনে দিলু হেসে আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে এল। প্রদীপকে বলল, 'নে, শুয়ে পড়।'

'কেন, দিলু ভাই?'

দিলু বলল, 'ঘণ্টাখানেকের জন্যে ওই চৌকিটা তোর বুকের উপর রাখব। প্র্যাকটিসের কথা বলছিলি না? ওই হলো প্র্যাকটিস! শত্রুদের যে কোন অত্যাচার সহ্য করার জন্যে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। এই তো, সপ্তাহখানেক ধরে আমি কালু ভাই-এর কাছে যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখলাম। পরে শিখব ছুরি-খেলার কৌশল।'

প্রদীপকে অবাক [কিছুটা ভীত] হতে দেখে দিলু রেগে গেল। বলল, 'গাধা কোথাকার, এই সব কায়দা-কানুনের কথা "দুর্দান্ত দস্যু গুর্গন খাঁ" বইয়ে পড়িস নি? তোকে তো বইটা পড়তে দিয়েছিলাম।'

'পড়েছি।' প্রদীপ সোজাসুজি বলল, 'কিন্তু, ভাই, আমি ওই দুই মন ওজনের চৌকি বুকে নিতে পারব না।'

দিলু খোলা গলায় হেসে উঠল। বলল, 'তুই বড় মজার কথা বলতে পারিস, প্রদীপ। এই বললি প্র্যাকটিস করবি আর এখনই "না" করছিস! আয়, তাহলে বক্সিং শেখাই।'

'বক্সিং?'

প্রদীপ কাতর হয়ে বলল, 'না শিখলে হয় না?'

'না, হয় না। এই নে, পরে নে। তুই "রেডি" বললেই আমি তোর ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব। অল রাইট?'

উপায়ান্তর না দেখে প্রদীপ হাতে গ্লাভ্স পরল। তার শরীর রোগা-পাতলা। হাতের মুঠি বার বার আলগা হয়ে পড়ছে। দিলু ঘরের এক কোণে গিয়ে বক্সিং-এর পোজ নিচ্ছে। সে হাতের থাবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শূন্যে ছুড়ছে আর প্রদীপকে বলছে, 'কী রেডি?'

প্রদীপ হিংস্র চোখে তাকাল। চোখ দেখে ওর মনের কথা বুঝলাম। তার ভাবখানা, 'কিছুতেই যখন ছাড়ছ না তখন এসো ... তোমারই একদিন কি আমারই একদিন ...'

'রে ... ডি ... আসছি ...'

দিলু মহানন্দে লাফাতে লাফাতে আসছে। প্রদীপও দেখলাম দারুণ একটা পোজ নিয়েছে। দিলু বাগিয়েছে কি বাগায়নি এই সময় উচ্চকণ্ঠে প্রদীপের মহা চিৎকার, 'এই, দিলু ভাই, থামো, থামো। সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু।'

দিলু তো মহা খাপ্পা। বক্সিং-এর বদলে চড় মেরে ফাউল করে বসে আর কী। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? কী সর্বনাশ হয়ে যাবে বলছিস?'

'তুমি তো কিছুতে কিছু শুনলে না ...' প্রদীপের চোখমুখ দুঃখে আর অভিমানে কালো বর্ণ দেখায়। হঠাৎ সে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বলে, 'আমি একটু বাথরুমে যাব।'

দিলু মহাব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রদীপকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায়।

এক ঘটনা 'দি গজা অনুসন্ধান কমিটি'র মেম্বারদের একটু দমিয়ে দেয়। দু-চারদিনের মধ্যে বলতে গেলে এক আমি ছাড়া দিলুর ওখানে আর কেউ যায় নি। দিলু বলল, 'কুচপরোয়া নেই। আমি একই যথেষ্ট। কারো সাহায্য লাগবে না।'

বললাম, 'তা না হয় হলো, কিন্তু তুই করবি কী?'

দিলু বলল, 'যে লোকটা প্রায় রোজ বিকেল বেলা গজাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে সেই লোকটাই গজাকে সরিয়েছে। একেবারে খাঁটি ক্রিমিনালের চেহারা। গাঁট্টাগোঁট্টা দেখতে, মাথায় ইয়াব্বড় বাবরি চুল, কানে জবা ফুল। চোখ সর্বদাই জ্বলছে।'

আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার দিকে তাকিয়ে দিলু আবার বলে, 'লোকটা নিশ্চয়ই এবার হেডমাস্টার সাহেবকে চিঠি দিয়ে জানাবে আপনার ভাগ্নে গজাকে আমরা সরিয়েছি। তাকে পেতে হলে অমুক জায়গায় রাত তিনটার সময় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যাবেন। যদি এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নিতে চেষ্টা করেন তাহলে গজার হাত-পা নুলা করে চিরদিনের মতো অথর্ব করে দেব। সাবধান।'

দিলুর কথায় আমি আঁতকে উঠি। 'বলিস কী রে! তাহলে আমাদের ... আমাদের গজার কী হবে ...'

দিলু বলল, 'তার আগেই অবশ্য গজাকে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসব। দাঁড়া আজকের দিনটা যাক।'

বললাম,'দিলু, একবার হেডমাস্টার স্যারের ওখানে গেলে কেমন হয়? ব্যাপারটা জানালে ...'

দিলু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'না, এখন আর যাব না। যাব একেবারে গজাকে সাথে নিয়ে ...'

সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। যে লোকটা হেডমাস্টার স্যারের বাসার কাছে সময়-অসময় ঘুরঘুর করে সেই লোকটাই অপরাধী। কাল আমরা দুজন, আমি ও

দিলু, লোকটাকে অনুসরণ করব। লোকটা নিশ্চয়ই আড্ডায় ফিরে যাবে। আমরা তাকে 'ফলো' করে আড্ডায় ঢুকে যাব ... তারপর ...'

দিলু ঘুষি বাগিয়ে ভয়ানক চোখ-মুখ করে বলল, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ...'

পরদিন আমি বাড়ি থেকে মাত্র বেরিয়েছি, হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ির গেটের কাছে দিলু দাঁড়িয়ে আছে। চোখ-মুখ দারুণ গম্ভীর। অবাক হলাম। অসময়ে দিলু এখানে কেন? কাছে যেতেই দিলু চোখ তুলে তাকাল। আমি বললাম,'কী রে, তুই এখানে কেন, কথা তো ছিল আমিই তোর ওখানে যাব।'

দিলু কথা বলে না। নিঃশব্দে একটুকরো কাগজ হাতে তুলে দেয়। কাগজে হাতের লেখাটা দেখে লাফিয়ে উঠি। গজার হাতের লেখা।

'গজার চিঠি না?' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি ...

গম্ভীরভাবে দিলু বলে, 'আগে তো পড় ... তারপর আনন্দ করিস।'

গজা চিঠিতে লিখেছে :

ভাই দিলু ও আতিক,

তোমাদের দুইজনকে চিঠি লিখিতেছি আর হাউমাউ করিয়া কাঁদিতেছি। দুঃখের কথা কী বলিব। গরমের ছুটির আগে আম খাইবার ও সেই সঙ্গে ছোটখাটো ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছা হয়। তাই কাউকে কিছু না বলিয়া পালাইয়া মামার বাড়িতে আসিয়াছিলাম। মেজো মামা আমাকে দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। তাঁহার শরীরের রঙ লাল টুকটুকে। কান ও নাকের ডগা সর্বদা লাল হইয়া থাকে। মোটাসোটা শরীর। প্রায় সর্বদাই শরীরের ভারে তিনি হাঁপাইতেছেন। দুই দিন যাইতে না যাইতেই আমাকে দেখিয়া তাঁহার খুশি হইবার কারণ বুঝিয়া ফেলিলাম। তিনি আমাকে পড়াইতে বসেন। কিছু একটা এদিক-ওদিক হইলেই শাস্তি। শাস্তিটা কী জানো? একটা ল, সা, গু বা গ, সা, গু অংক না পারিলে এক হাজার ঘামাচি মারিতে হয়, ইংরেজি অনুবাদে প্রতিটি ভুলের জন্য দুই হাজার ঘামাচি মারিতে হয়। ভূগোল, ইতিহাস, উর্দু সব বিষয়ের ভুলের জন্যই মামা হাজার হাজার ঘামাচি মারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মামার পিঠে ও ঘাড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঘামাচি। ঘামাচি মারিতে মারিতে প্রায় শেষ হইয়া গেলাম। বড় মামাকে [হেডমাস্টার সাহেবকে] কান্নাকাটি করিয়া এইবারটি মাফ করিয়া দিতে লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে মাফ করিয়াছেন ও গরমের ছুটির সবটা এখানে কাটাইবার অনুমতি দিয়াছেন। ঘামাচি-মামার হাতে রহিয়াছে সেই অর্ডারখানা। এদিকে গরমের ছুটি মাত্র শুরু হইল, আমি কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে সকাল দুপুর বিকাল এই ঘামাচি মারার হাত হইতে বাঁচাও ...

ইতি—

হতভাগ্য গজা।

আমি একেবারে থ। দিলুর দিকে তাকালাম। দিলু বলল, 'গজা একটা ইডিয়ট। গেল অ্যাডভেঞ্চার করতে, আর গিয়ে ঘামাচি মারছে। হুঁঃ, যত্তোসব!'

ছয়

গজা ফিরে আসার পর 'দি গজা অনুসন্ধান কমিটি'র আর কোনো কাজ রইল না। সুতরাং কমিটি ভেঙে দেওয়া হলো। সবাই মিলে ঠিক করলাম গরমের ছুটিতে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। 'দুষ্টু শফিক' নাটকটি মঞ্চস্থ করব ঠিক হলো। এতে শফিকের ভূমিকা নেবে গজা, দিলু সাজবে গুণ্ডা-সর্দার, প্রদীপ নেবে শফিকের বন্ধু লতিফের পার্ট আর আকবর অভিনয় করবে শফিকের বাবার ভূমিকায়। আমাকে আর সুনির্মলকে দেওয়া হলো স্মারকের কাজ। সবকিছু ঠিকঠাক, গোলমালে পড়লাম পরিচালক কে হবে তা নিয়ে। হঠাৎ টুলের উপর বসা সাজাহান ভাই গম্ভীর চালে উঠে দাঁড়াল। নবাবি চালে ঘরের একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। ইতিমধ্যে আমরা সবাই 'থ' হয়ে গেছি। সাজাহান ভাই-এর দিকে তাকিয়ে আছি। সাজাহান ভাই একাধারে আমাদের পরিচালক, বন্ধু ও দার্শনিক। বয়স সাঁইত্রিশ বছর। কাঠির মতন শরীর। তবে তার ঠোঁটের দুপাশে ঝুলানো গোঁফ জোড়া বেশ স্বাস্থ্যবান। বছর খানের অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দুদিন হলো ফিরেছে। তাকে উঠতে দেখে আমরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকি। দিলুই নীরবতা ভাঙল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাজাহান ভাই কি পরিচালক হতে রাজি আছেন?'

'আছি।' পায়চারি থামিয়ে সাজাহান ভাই তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কিন্তু আমার ডিরেকশন তোমরা "লাইক" করবে?'

সাজাহান ভাই নিজেরই ভাষায় খাঁটি 'অরিজিনাল' ছেলে। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলার অভ্যাস। তার কথা শুনে আমরা বললাম, 'কেন পছন্দ করব না, সাজাহান ভাই? আপনি পরিচালনার ভার নিলে আমরা খুব খুশি হই।'

'ইজ ইট?' সাজাহান ভাই ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, 'বেশ, আমি "ওয়েট" (ভার) "টেক" করলাম। কিন্তু একটা "কন্ডিশন" আছে।'

দিলু বলল, 'কী কন্ডিশন?'

'কন্ডিশন হলো আমি যা "সে" করব তা-ই "অবে" করতে হবে। কেউ আমার কথা "ডিসওবে" করলে যা খুশি "পানিশমেন্ট" দিতে পারব। কী রাজি?'

'নিশ্চয়ই রাজি।'

আমাদের সবার হয়ে আকবর বলল, 'আমরা এমন একজন স্ট্রিক্ট পরিচালককেই চাইছিলাম।'

সাজাহান ভাই উপর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কেন হাসছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সাজাহান ভাই-এর যতটুকু আমরা দেখেছি তাতে ভাল করে জেনেছি যে, সাজাহান ভাই সব ব্যাপারে অসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ থেকে পৃথক। এমন কি তার চেহারার সঙ্গে পর্যন্ত আর দশটা লোকের মিল নেই। এ নিয়ে সাজাহান ভাই-এর ভারি গর্ব। তিন বছর আগে প্রথম যেদিন আকবরদের বাগানের ঘরে আমাদের সকলের সঙ্গে তার দেখা হয়, সেদিন তো শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে আমরা কথাই বলতে পারি নি। সর্বক্ষণ সাজাহান

ভাই-এর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলাম। কথা বলার কী সুন্দর কায়দা সাজাহান ভাই-এর। কথা বলার সময় হাত নাড়ার ঢেউ ওঠে, আঙুলগুলি নাচে। বুকে আঙুল ঠুকে, সেদিন সাজাহান ভাই বলেছিল, 'আমি সাজাহান। আমি "অরিজিনাল দি গ্রেট"। সব ব্যাপারে সাধারণ থেকে আমি ডিফারেন্ট। বুঝলে?'

আমরা হাঁ করে ছিলাম। সাজাহান ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলেছিল, 'আন্ডারস্ট্যান্ড' করতে পারো নি বোধ হয়?'

গজা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। বলেছিল, 'কিচ্ছু না। বুঝব কী, আপনার কথা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে।'

'ময়লা চাদর কোথাকার,' সাজাহান ভাই গজাকে গালি দিয়েছিল, 'এমন একটা "সিম্পল" কথা "আন্ডারস্ট্যান্ড" করতে পারলে না, তোমরা সব ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট।'

আমরা তো হাঁ। সাজাহান ভাই আমাদের ভাব বুঝল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই দেখো একটা গালি দিলাম তাও বুঝতে পারল না। হতভাগ্য আর কাদের বলে। হাঁ করে আছ কেন? প্রত্যেকটি শব্দ থেকে প্রথম অক্ষরটি নাও, নিয়ে কী হয়?'

সুনির্মল হিসাব করে বলল, 'ইডিয়েট।'

'হ্যাঁ, তোমরা ওই! ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট! আরে, "অরিজিনাল" কথাটা বুঝতে পারলে না? ওর মানে হলো মৌলিকতা। অর্থাৎ আমার সবকিছু সাধারণ থেকে আলাদা। এমনকি গালিগুলি পর্যন্ত।'

আকবর গদগদ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

আকবরের এই সায় দেওয়ায় সাজাহান ভাই খুব খুশি। বলল, 'আমার দিকে তাকা, আকবর। বল তো আমার নাকটা কেমন?'

আকবর খুব ভালভাবে দেখে চোখ ঘুরিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'পাতিহাঁসের ঠোঁটের মতো ...'

সাজাহান ভাই খুশি হলো কি রাগ করল কিচ্ছু বোঝা গেল না। বলল, 'চোখ দুটি?'

আকবর বলল, 'চোখ দুটি? ঠিক চার আনা দামের রসগোল্লার মতো।'

'হোয়াট!' রাগে-অপমানে সাজাহান ভাই যেন ফেটে পড়ল। বলল, 'অ্যান্ড থুতনি?'

আকবর এতক্ষণ উৎসাহের সঙ্গে চেহারার যথাসম্ভব বাস্তব বর্ণনা দিচ্ছিল। সাজাহান ভাই রাগ করেছে দেখে সে ঘাবড়ে যায়। সাজাহান ভাই আস্ফালন করে বলল, 'অ্যান্ড মাই থুতনি?'

ঢোক গিলে আকবর বলল, 'ভয়ে বলব না নির্ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

সাজাহান ভাই সাতিশয় উদার হয়ে গেল। গলার স্বরে মায়া ও মমতা মিশিয়ে বলল, 'নো ভয়। নির্ভয়ে বল্।'

আকবর বলল, 'নো থুতনি! আপনার থুতনি নেই।'

'থুতনি নেই মানে?

সাজাহান ভাই প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। থুতনি ছাড়া 'লিভ' করছি কিভাবে?

'আছে,' আকবর সংশোধন করে বলেছিল, 'যৎসামান্য থুতনি আছে। তবে প্রথম দেখায় সবাই ঠিক ঠাওর করতে পারবে না।'

'তুই একটা কাগজের খালি ঠোঙা!' আর না পেরে সাজাহান ভাই প্রাণপণে গালি চালিয়েছিল, 'একটা থেঁতলানো কলার খোসা! ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট কাঁহেকা!'

এইভাবে সাজাহান ভাই-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। আমরা সাজাহান ভাইর মেধা ও প্রতিভায় একেবারে মুগ্ধ। দিলু যে দিলু সে পর্যন্ত সব দেখেশুনে হাঁ হয়ে গেছে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করি, 'হ্যাঁ, অরিজিনালিটি আছে বটে সাজাহান ভাই-এর। এই সাজাহান ভাই যদি নাটক পরিচালনার ভার নেয় তাহলে চিন্তা কী?'

আমরা সাজাহান ভাই-এর কথায় উৎসাহে ও আনন্দে আটখানা। সুনির্মল বলল, 'আপনি যদি ভার নেন, সাজাহান ভাই, তাহলে আর কথা কী? কাল থেকেই রিহার্সেল শুরু হয়ে যাক।'

সায় দিয়ে গজা বলে, 'হ্যাঁ। আমরা সবাই আপনার "অর্ডার" পালন করব।'

'অল রাইট।'

পায়চারি থামিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সাজাহান ভাই, 'তাহলে কাল থেকে রিহার্সেল স্টার্ট হবে। তোমরা কেউ এর আগে স্টেজে মানে মঞ্চে নেমেছ?'

প্রথমটায় কেউ সাড়া দেয় না। অনেকক্ষণ পর সুনির্মল উস্‌খুস করে সামান্য গলাকাশি দিল। সাজাহান ভাই তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কী, তুমি তাহলে নেমেছ?'

'হ্যাঁ।' সুনির্মল ধীরস্থিরভাবে বলল, 'নাটক শুরু হবার আগে একবার আর নাটক শেষ হবার পরে একবার মঞ্চে ওঠা-নামা করেছিলাম। পাড়ার নাটক কি না, আমাকে সেট করা, সেট ভাঙার কাজ দেওয়া হয়েছিল।'

তীব্র দৃষ্টিতে সাজাহান ভাই তার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর সংক্ষিপ্ত গালি ঝাড়ল, 'পা, পা, ঝা কোথাকার!'

আকবর ফিসফিস করে বলল, 'এর অর্থ হলো পাজির পা-ঝাড়া কোথাকার। শুনতে চমৎকার, তাই না?'

'হিয়ার!' সাজাহান ভাই গম্ভীরভাবে বলতে শুরু করল, 'কাল নাটকের রিহার্সেল শুরু হবে। বই ধরার আগে অন্তত "থ্রি ডেজ" অভিনয় শেখার তালিম নিতে হবে। সবাই কাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত এই ঘরে আমার কাছ থেকে "অ্যাকটিং লার্ন" করবে। যাও আজ ঢং ঢং।'

সবাই আমরা যে যার বাসায় চলে গেলাম। পরদিন দশটার সময় আকবরদের বাগান-ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখি দিলু আগেই এসে বসে আছে।

বললাম, 'কী রে, নাটকের নামে তোর দেখি তর সইছে না।'

দিলু বলল, ' "অ্যাকটিং" কি মুখের কথা যে ছেড়ে দিলেই হলো? "অ্যাকটিং" শিখতে হবে। আমি খুব সিরিয়াস।'

সাজাহান ভাই আরো সিরিয়াস। কিছুক্ষণ হাতেকলমে পরীক্ষা করে আমাদের দলটাকে এ. বি. সি—এই তিন দলে ভাগ করল। যারা অভিনয়ে একদম আনাড়ি তারা 'সি' গ্রুপে; যারা কিছু কিছু জানে তারা 'বি' গ্রুপে; আর যাদের অভিনয়ে সহজাত ঝোঁক আছে, অভ্যাস করালে হয়ে যাবে তাদের রাখা হলো 'এ' গ্রুপে।

'রেডি—' বাজখাঁই গলায় হুকুম ছাড়ল সাজাহান ভাই।

'আমার পরবর্তী "অর্ডার" না পাওয়া পর্যন্ত "সি গ্রুপ" কেঁদে যাও, "বি গ্রুপ" হাসতে থাকো আর "এ গ্রুপ" ...'

সাজাহান ভাই হঠাৎ থামল। দম নিল। তারপর বলল, ' "এ গ্রুপ"—তোমরা পাঁচ মিনিট কাঁদবে, পাঁচ মিনিট হাসবে। ক্লিয়ার?'

তিন গ্রুপই শুরু করতে যাচ্ছিল। সাজাহান ভাই বলল, 'না হয় নি, দাঁড়াও।'

সবাই থেমে গেল। সাজাহান ভাই বলল, 'হাসি ও কান্না অনেক কিসিমের আছে। অট্টহাসি, ভ্যাক-ভ্যাক হাসি, মুচকি হাসি, "সাউন্ডলেস" হাসি, ডেন্টাল মানে দেঁতো হাসি, "ইঁঃ ... হিহ্-হি" রকমের গড়িয়ে পড়া হাসি ... বলতে কি হাজার রকমের হাসি আছে। কোন্ হাসিটা তোমরা এখন হাসবে জানো? দেঁতো হাসি। প্রথম টাস্ক কি না, তাই সহজ হাসিটাই রাখলাম। কিচ্ছু না, ওন্‌লি থার্টি টু টিথ্ ওপেন করে রাখো, ... ব্যস হয়ে গেল।'

'আর আমরা?' 'সি' গ্রুপ থেকে কাঁদ কাঁদ আকবর প্রশ্ন করল।

সাজাহান ভাই বলল, 'তোমরা যেভাবে খুশি কেঁদে যাও। মোট কথা "ক্রাই" করলেই হলো। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'সি' গ্রুপে প্রদীপ খুব মাথা খাটিয়ে প্রশ্ন করল, 'যদি চেষ্টা করেও কান্না না আসে?'

সাজাহান ভাই বলল, 'সেটাও আমি "থিঙ্ক" করে রেখেছি। চেষ্টা করেও যদি কাঁদতে না পারো তাহলে পেটের চামড়া ধরে "ফাইভ টাইমস" রাম-চিমটি কাটব। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

এই কথা শুনেই প্রদীপ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সাজাহান ভাই বলল, 'ওকি, তুমি "ক্রাই" করবে তো, বিলাপ করছ কেন? বিলাপ আর কান্নার মধ্যে অনেক "ডিফারেন্স" আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও, "এভরিবডি রেডি, স্টার্ট"!"

অভিনয়ের তালিম শুরু হয়ে গেল! 'এ' গ্রুপ পাঁচ মিনিট হাসির পর কাঁদছে, পাঁচ মিনিট কেঁদে হাসছে। 'বি' গ্রুপ দাঁত বার করে হাসছে। 'সি' গ্রুপের

অবস্থাই গুরুতর রকমের ভাল বলতে হবে। সকলেই আন্তরিকভাবে একটানা কেঁদে চলেছে।

'গুড!' সাজাহান ভাই খুশি হয়ে মন্তব্য করল, 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। ড্রামা একখানা যা করব একদম চল্টা মল্টা তল্টা হুঙ্কার ... মানে চমৎকার ...'

মন্তব্য শুনে আর এক ডিগ্রি উৎসাহ বাড়ল। তালিমে কাজ হচ্ছে দেখে সাজাহান ভাই দারুণ খুশি। বলল, '"গো অন"। যাকে বলে চল্টা, মল্টা, তল্টা হুঙ্কার। চালাও, চালাও।' সবাই যে যার 'তালিম' আওড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু 'বি' গ্রুপের গজা হঠাৎ হাসির বদলে খুক্ খুক্ কাশতে কাশতে থেমে গেল। সাজাহান ভাই বলল, 'কী হলো? থামলে কেন?'

'থামলাম,' গজা বোঝাবার চেষ্টা করে, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ।'

'মানে?' সাজাহান ভাই দারুণ অবাক, 'মানেটা কী হলো?' গজা বঙ্গানুবাদ করে, 'গলা শুকিয়ে একদম "উড" মানে কাঠ, পানি খাব ...'

গজাকে পানি খাওয়ানো হলো। সাজাহান ভাই বিরক্ত হয়ে বলে, 'খালি আছে ফাঁকির তালে। ইলিস্পু ডিলিস্পু য়েস্‌কট টস্‌কট কোথাকার।'

সবাই সজাগ হয়ে গেল। সাজাহান ভাই-এর বকুনিতে খুব ধার। তার কথার এদিক-ওদিক করা চলবে না।

তিনদিন পুরোদমে অভিনয় শেখার তালিম চলল। তারপর শুরু হলো নাটকের রিহার্সেল। সবই মোটামুটি ঠিক আছে, দেখা গেল শফিকের বাবার ভূমিকায় শুধু আকবর সুবিধে করতে পারছে না।

'তুই দেখছি নাটকের "টুয়েলভো ক্লক রিং" করিয়ে ছাড়বি ...'

আকবরের প্রতি কটাক্ষ করে সাজাহান ভাই, 'তোর তো একদম কোন আইডিয়া হয় নি অ্যাকটিং সম্পর্কে। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল বাপু তোকে নিয়ে।'

আকবর অতিশয় লজ্জিত। দিলু হঠাৎ প্রস্তাব দেয়। যদি আপত্তি না থাকে, সাজাহান ভাই, আপনিই শফিকের বাবার রোলটা করুন না ...'

'দূর, আমি ...'

সাজাহান ভাই মৃদু গোছের আপত্তি জানায়। কিন্তু প্রস্তাবটা ততক্ষণে সকলের মনঃপূত হয়ে গেছে।

সুনির্মল বলে, 'বাঃ, দূর কেন? এক আকবরের জন্যে যদি নাটকটা খারাপ হয় তাহলে তাকে বদলিয়ে নেয়াই কি উচিত না?'

সবাই বলল, 'হ্যাঁ, সাজাহান ভাই, শফিকের বাবার রোল আপনাকেই করতে হবে। আপনি ছাড়া অমন শক্ত রোলে কেউ ভাল করতে পারবে না।'

'অলরাইট,' সাজাহান ভাই দুহাত উপরে তুলে সকলকে আশ্বস্ত করে, 'রোলটা আমিই নিলাম। তোরা ঠিকই বলেছিস, আমি ছাড়া গুণ্ডা-সর্দার দিলুর পাশাপাশি ওই রোলে কেউ জমাতে পারবে না।'

রিহার্সেল খুব জমে গেল। কিন্তু মুশকিল হলো একটি দৃশ্য নিয়ে। এই দৃশ্যে গুণ্ডা-সর্দার কালু মিয়ার আস্তানায় কালু মিয়ার সঙ্গে শফিকের বাবা চৌধুরী সাহেবের তুমুল কথা কাটাকাটি। গুণ্ডা-সর্দার কালু মিয়া শফিককে বন্দী করেছে। পিতা চৌধুরী সাহেব কালু মিয়ার কাছ থেকে ছেলেকে ফেরত চাইলেন। কালু মিয়া কিছুতেই দেবে না। চৌধুরী সাহেব রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। কালু মিয়া ধাঁই করে দুই চড় বসিয়ে দিল চৌধুরী সাহেবের গালে। চৌধুরী সাহেব আর্তনাদ করে উঠলেন।

এই হলো দৃশ্যটি। চড় মারার আগে পর্যন্ত দিলুর অভিনয় ভালই হলো। কিন্তু চড় মারতে গিয়ে তার ভাবান্তর ঘটল।

সাজাহান ভাই চড়া মেজাজে বলে, 'ঠ্যাং কাঁপে কেন, দিলু? চড় বসিয়ে দাও ...'

'পারব না,' দিলু পরিষ্কার জবাব দিল, 'আপনাকে চড় মারতে পারব না।'

'মারতেই হবে। কই মারো ...'

দিলু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সাজাহান ভাই বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'অ্যাকটিং ইজ অ্যাকটিং। এতে লজ্জা-শরমের কী আছে?'

দিলু তখন ঠাস ঠাস করে সাজাহান ভাই-এর দুই গালে দুই চড় বসিয়ে দিল।

সেই দিন থেকে রিহার্সেলেরও কোনো অসুবিধে রইল না। রিহার্সেল জমে উঠল। দশদিন রিহার্সেল দেওয়ার পর বোঝা গেল এখন দিব্যি নাটক মঞ্চস্থ করা যায়। পাড়ার ছেলেরা কোমর বেঁধে লাগল। রসুলপুর লজের ফাঁকা মাঠের এক ধারে স্টেজ বাঁধা হলো। আলোর ব্যবস্থা করল পাড়ারই রহমত মিস্ত্রি। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হলো নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আনাগোনা। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো উপস্থাপক আকবর ঘোষণা করল, 'ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, এবারে আমাদের নাটক "দুষ্টু শফিক" শুরু হলো।'

বলতে না বলতেই মঞ্চের পর্দা উঠল। নাটক শুরু হয়ে গেল। চৌধুরী সাহেবের ভূমিকায় সাজাহান ভাই অপূর্ব অভিনয় করল। ছেলেকে হারিয়ে এমন তীক্ষ্ণ গলায় কেঁদে উঠল যে দর্শকের গ্যালারিতে একটি পাঁচ বছরের ছেলে ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু সব আয়োজন, সব অভিনয়, সব কলা-কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন যদি জানি এরকম হবে তাহলে আদপে নাটক করতেই যেতাম কিনা সন্দেহ।

ঘটনাটি আর কারো নয়, দিলুর। খুব 'মুড' নিয়ে সে অভিনয় করছিল। দিলুর অভিনয় দেখে চারদিকে ঘনঘন হাততালি পড়তে লাগল। দিলু এমন আশ্চর্য ভাল অভিনয় করতে পারবে তা কি জানতাম। আমি প্রম্‌ট্ করছি আর যতরকমে পারি ইশারা-ইঙ্গিতে দিলুকে বাহবা দিচ্ছি। অবশেষে সেই চপেটাঘাতের দৃশ্যটি এল। শফিকের বাবা চৌধুরী সাহেব প্রথমে খুব কাকুতি-মিনতির সঙ্গে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। কালু গুণ্ডা দেবে না। তখন চৌধুরী সাহেব হুঙ্কার দিয়ে

উঠলেন। হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে কি ওঠেনি, হঠাৎ দেখি কালু গুণ্ডার চড় খেয়ে বিকট প্রাণঘাতী চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সাহেব পপাতধরণীতল।

পড়ে গিয়ে সাজাহান ভাই চেঁচাতে লাগল, 'ওরে বাবারে, আমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছে রে বাবা, আমাকে "কিল" করে ফেলেছে ... কে কোথায় আছ, আমাকে "সেভ" করো দিলু গুণ্ডার হাত থেকে।'

দর্শকমণ্ডলী ভাবল অভিনয় হচ্ছে। তারা জোর হাততালি দিতে লাগল।

আরো রেগে গিয়ে সাজাহান ভাই চেঁচাতে লাগল, 'আমি "সেভেন্‌টি ফাইভ পার্সেন্ট কিল্‌ড্‌" হয়ে গেছি রে বাবা! ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কটগুলোর পাল্লায় পড়ে একদম শেষ ... ওরে আকবর, ব্রাদার আকবর, আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ...'

দর্শকদের মধ্যে সহানুভূতির সাড়া পড়ে যায়। ছেলের শোকে চৌধুরী সাহেবের মাথা খারাপ হয়েছে—আহা, কী করুণ দৃশ্য, ভেবে অনেকেই অশ্রু মোচন করতে লাগল।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সুনির্মল বুঝতে পারে নি। স্ক্রীনের ওই পাশ থেকে সে সমানে সাজাহান ভাই-এর উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'পার্ট ঠিক হচ্ছে না, সাজাহান ভাই, এইবার উঠে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে বলুন : কালু আমাকে তুমি মারলে? বলুন, কালু আমাকে তুমি মারলে?'

সাজাহান ভাই হঠাৎ কী ভেবে, বোধহয় অতিরিক্ত অপমান বোধেই, বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল, তারপর ফিট।

শুরু হলো হৈ চৈ, গণ্ডগোল। আর কি, নাটক ভেঙে গেল। সাজাহান ভাইকে নিয়েই সকলে ব্যস্ত। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফেরানোর পর আর এক সমস্যা। খেপে গিয়ে বারবার সাজাহান ভাই বলছে, 'দিলুটা কোথায়, ওকে "কল্‌" করো, ওকে আমি "কিল" করব।'

কিন্তু কোথায় দিলু? দিলুকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের হাত থেকে তার লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেল। লিখেছে, 'সাজাহান ভাই, মুড খুব বেশি হইয়া যাওয়াতে এইরকম ঘটিয়া গিয়াছে। আমি খুবই লজ্জিত। আশা করি অপরাধ ক্ষমা করিবেন।' ইতি— দিলু।

সাজাহান ভাই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট কোথাকার।'

সাত

সাজাহান ভাই তো দারুণ খেপে গেল। দিলুর সাথে সাথে আমাদেরও বিসর্জন দিল। নাটকের ঘটনায় দিলু খুবই অনুতপ্ত। কিন্তু সাজাহান ভাইয়ের এক কথা, 'তোদের সাথে আর কোন টক নেই। তোরা হলি যাকে বলে "ম্যাড ডগ"।

অ্যাকটিং করতে গিয়ে দিব্যি কিনা থাপ্পড় ঝেড়ে বসল! না বাবা, তোদের সাথে আমি নেই।'

একদিন বুঝিয়ে শুনিয়ে সবাইকে এনে জড়ো করা হলো ক্লাব-ঘরে। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

আকবর এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছিল। ক্লাব-ঘরের বেঞ্চিতে প্রদীপ, আকবর, গজা, দিলু, সুনির্মল সবাই বসে আছি চুপচাপ। সামনে অস্থির পায়ে পায়চারি করছে সাজাহান ভাই।

সুনির্মল বলল, 'তাহলে দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলি, সাজাহান ভাই?'

পায়চারি থামিয়ে তাচ্ছিল্য করে সাজাহান ভাই বলে, 'কিসের কী কিছুই ঠিক নেই, তিনি আগেই দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেন! পা-পা-ঝা কোথাকার!'

সাজাহান ভাই কি তাহলে ব্যাপারটা কিছুতেই সহজ করে দেখতে পারবে না? আমরা সবাই চিন্তায় পড়ি। এ ওর মুখের দিকে তাকাই। নাটকের সেই মারধরের অতি নাটকীয় ঘটনার জন্যে দিলু মাফ চেয়ে পাঠিয়েছিল সাজাহান ভাইয়ের কাছে। যা হয়ে গেছে তা যেন সাজাহান ভাই ক্ষমা করে। ভুল-ত্রুটি মানুষেরই হয়, দিলুরও হয়েছিল। বড় হয়ে সাজাহান ভাই কি তা মাফ করবে না?

'না, করবে না ...' ক্লাব-ঘরে পায়চারি করতে করতে নাটকীয়ভাবে জানায় সাজাহান ভাই। এমন সুন্দর জমানো একটা নাটক দিল বরবাদ করে ... আখাম্বা, আচাভুয়া, করীষটাকে 'ফরগিভ' করবে সাজাহান? অসম্ভব, অসম্ভব!

সাজাহান ভাই অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। ফস্ করে গজা বলে, 'সাজাহান ভাই!'

'কী রে?'

'আখাম্বা, আচাভুয়া, করীষ মানে কী?'

'এই দ্যাখো!' সাজাহান ভাই রাগ করে, 'বাংলায় গালি দিলুম তার আবার ট্র্যান্‌স্লেশন করে দিতে হবে। গজা, তুই একটা হলহলিয়া।'

'বুঝলাম না।'

'তা বুঝবি কেন—আছিস তো বাঁদরামিতে। নে, নোট করে রাখ। আখাম্বা হলো থামের মতো বেঢপ লম্বা, আচাভুয়া হলো অত্যদ্ভুত, করীষ হলো ঘুঁটে!'

'আর হলহলিয়া!'

'হলহলিয়া হলো মরা সাপ। না, তোদের নিয়ে "মুভ" করাই মুশকিল, রাগ করব তাও বুঝবি না। গালাগালি দেব তাতেও গাধার মতো হাঁ করে থাক্‌বি। যতসব ময়লা চাদর! উঃ গড্, এ-পাড়া থেকে কবে যে "গো" করব! নে, কী বলছিলি, কুইকলি বলে ফেল।"

'দিলুকে আপনি মাফ করে দিন, সাজাহান ভাই। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দিলু খুব লজ্জিত!' আমি সুপারিশ করি।

'লজ্জিত! হুঁ, লজ্জিত বললেই যেন আমি বর্তে গেলাম! যতসব কলেরা ইঞ্জেকশন কাঁহেকা!'

দিলু এবারে মুখ খোলে, 'বেশ তো, শুধু লজ্জিত বললে যদি না চলে তাহলে আপনার যা খুশি শাস্তি দিন।'

আকবর যোগ করে, 'হ্যাঁ, শাস্তি দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন। যা হয়ে গেছে তো গেছেই, আমরা পরের প্রোগ্রামটা ভাল করতে চাই।'

সাজাহান ভাই উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করে বেড়ায়। বিড়বিড় করে বলে, 'মুখে তো খুব শাস্তির কথা বল্‌তে জানিস। কিন্তু আমি হলাম গিয়ে গ্রেট সাজাহান, অরিজিনাল সাজাহান। যেমন-তেমন সাধারণ শাস্তি আমি দিলে তা আমাকে মানাবে কেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে তা মানাবে কেন?' সায় দিল সুনির্মল, বলল, 'আচ্ছা, সাজাহান ভাই, এক কাজ করলে কেমন হয় ...' সুনির্মলের চোখ পিটপিট করে, [আমার মনে হলো সুনির্মল যেন ঠাট্টা করছে] 'দিলুর গায়ের চামড়া উৎড়িয়ে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালে কেমন হয়?'

প্রস্তাবটা খুব তাচ্ছিল্যের সাথে শোনে সাজাহান ভাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'মন্দ হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা খুব অর্ডিনারি হয়ে যায়। তা ছাড়া গায়ের চামড়া না হয় উৎড়ালি কিন্তু ডালকুত্তা পাবি কোথায়? না, এ হয় না!'

'তাহলে?'

সবাই ভাবিত হয়ে পড়ে। সাজাহান ভাইয়ের স্ট্যান্ডার্ড-মাফিক শাস্তি খুঁজে পাওয়া না গেলে প্রীতিসম্মিলনীর পরিকল্পনাটাই বাতিল করে দিতে হয়।

'এক কাজ করুন, সাজাহান ভাই ...' গজা খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলে, দিলুর কানটা না ধরে ইয়া দুই চটাস চটাস রাম চড় লাগিয়ে দিন। দেখবেন সব বিলকুল ঠিক হয়ে গেছে।'

চড়ের প্রস্তাবে সাজাহান ভাই রেগে যায়। বলে, 'তুই একটা ঝাঁই, একটা জম্বুরা ... ওই যা, বাংলা গালি ট্র্যান্‌স্লেশন না করলে তো আবার তোরা কিছু "আন্ডারস্ট্যান্ড" করতে পারিস না। নে, নোট করে রাখ, ঝাঁই হলো রাগী মাছ আর জম্বুরা মানে হলো ভীমরুল।'

গজা গালি খেয়ে চুপ করে যায়। আবার শুরু হয় ঘরের এদিক থেকে ওদিকে সাজাহান ভাইয়ের অস্থির পদচারণা। আমরা আবার চিন্তিত হয়ে মনে মনে একটা অরিজিনাল শাস্তি খুঁজে বেড়াই। দিলুও।

অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ নেই। সবাই ভাবছে। দিলু পর্যন্ত চিন্তা করছে কী করা যায়। ক্লাব-ঘরে সাজাহান ভাইয়ের চটি-জুতার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'পেয়েছি।' সাজাহান ভাই হঠাৎ পায়চারি থামায়।

সবাই কথাটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি, 'কী বললেন, সাজাহান ভাই, পেয়েছেন?'

'ইয়েস, পেয়েছি। একটা শাস্তি "ক্যাচ্" করেছি? কিন্তু ...'

'কিন্তু কী, সাজাহান ভাই?'

'না ভাবছি দিলু যদি শাস্তি নিতে গিয়ে আবার বেয়াদবি করে।'

"অসম্ভব!" দিলু নিজেই জবাব দিল, 'আপনি যা শাস্তি দেবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব, সাজাহান ভাই।'

'বেশ তাহলে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। শোনো, দিলু, তোমাকে যে "পানিশমেন্ট" দেওয়া হচ্ছে সেটা দুভাগে বিভক্ত। পার্ট ওয়ান, পার্ট টু। পার্ট ওয়ানের জন্য প্রস্তুত হও। আকবর, একটা টেবিল ঘড়ি নিয়ে আয় তো চট করে। কুইক!'

আমরা কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম সাজাহান ভাইয়ের দিকে। আকবরও তাকিয়ে ছিল।

সাজাহান ভাইয়ের আদেশ শুনে ঘড়ি আনার জন্যে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাজাহান ভাই আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'সাধারণত শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয় চামড়ার উপর। গায়ের চামড়ার উপর শাস্তি দেওয়া অত্যন্ত অর্ডিনারি ব্যাপার। আমি ঠিক করেছি, স্নায়ু আর গলার স্বরের উপর শাস্তি দেব। স্বরের উপর শাস্তি দেওয়াটা পৃথিবীতে আমিই প্রথম অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। দিলু বি রেডি!'

'আমি তৈরি আছি, সাজাহান ভাই।'

আকবর এ সময় একটা টেবিল-ঘড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘড়িটা হাতে নিল সাজাহান ভাই। সময় দেখে বলল, 'এখন বাজে দশটা বিশ। সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত শাস্তির "পার্ট ওয়ান" চলবে। এখন শোনো, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।'

ঘড়িটা কোণের একটা নড়বড়ে টেবিলের উপর রেখে দেয় সাজাহান ভাই। আমাদের সবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'আগেই বলেছি শাস্তিটা হলো গলার স্বরের উপর একটা শব্দ দিচ্ছি—ঔখাম্বাড্রাঠ্রাখ্রাঘ্রাষ্ঠেৎ। এই শব্দটা সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত দিলুকে উচ্চারণ করে যেতে হবে। ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলে চলবে না, একসঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে। আর উচ্চারণে ভুল করলে প্রতিটি ভুলের জন্যে এক এক মিনিট বেড়ে যাবে। অলরাইট?'

দিলু গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। তার চোখে-মুখে এতক্ষণে আতঙ্ক দেখা দেয়। ঢোক গিলে বলে, 'র'ফলাগুলো বাদ দিলে হয় না, সাজাহান ভাই?'

'না হয় না। র'ফলা দিয়ে, যুক্তাক্ষর আর দীর্ঘ স্বরের অক্ষর দিয়ে বুঝেশুনেই শব্দটা 'মেক' করা হয়েছে। এই শব্দটা উচ্চারণ করতে পারবে না বলে যদি মনে হয় তোমার, তাহলে অবশ্য আর একটা শব্দ আছে ... সেটা "ট্রাই" করতে পারো। সেকেন্ড শব্দটা হলো ৎস্মিঙ্দ্রাষ্টিহিহূহাহোহেআউফ ...'

'সাবধান, দিলু,' চেঁচিয়ে ওঠে গজা, 'দুই নম্বরটা নিবি না বলে দিলাম। দম আটকে মারা যাবি ...'

ছলছল হয়ে দিলু বলে, 'এক নম্বরটাই নিলাম।'

'অলরাইট। ঔখাম্বাড্রাঠ্রাখ্রাঘ্রাঠেৎ ... সাড়ে দশটা বাজে। স্টার্ট ...'

একটা কাগজে শব্দটা দিলুকে লিখে দেওয়া হলো। শব্দটা সে উচ্চারণ করতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘড় ঘড় শব্দে ঘর ভরে গেল। মাঝে মাঝে ভুল হলেই চেঁচিয়ে ওঠে সাজাহান ভাই। আরো মিনিট যোগ করা হয়।

গজা ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলে, 'দিলুটা যা পাগলা রে, আতিক, উচ্চারণ করতে করতে না আবার রেগেমেগে চেঁচিয়ে ওঠে।'

কিন্তু না, সে রকম কিছুই হলো না। দিলু বাধ্য ছেলের মতোই উচ্চারণ করে চলল। মাঝে অবশ্য আটকে যাচ্ছিল আর ভুলও করছিল। তার জন্যে সময় বাড়তে বাড়তে দুটো পাঁচ বেজে গেল।

'পার্ট ওয়ান "গন"। এবারে "পার্ট টু" শুরু হবে। এই শাস্তিটাও গলার স্বরের উপর ...'

সাজাহান ভাই গম্ভীরভাবে বক্তৃতা দেয়। ডাক দেয়, 'গজা।'

'জি, সাজাহান ভাই।'

'ওজনের দিক দিয়ে কিল ক'রকম হতে পারে রে?'

'তিন রকম,' গজা পণ্ডিতি চালে হিসেব-নিকেশ করে বলে, 'রাম কিল, মাঝারি কিল, মুঠি কিল।'

'তার মানে বড় কিল, মাঝারি কিল, ছোট কিল, তাই না? ঠিক বলেছিস তুই। আচ্ছা, গজু, কিল ভেদে চিৎকার ক'রকম হতে পারে বলে তোর ধারণা?'

'আমার তো ধারণা,' কিল-বিশারদ গজা বলতে শুরু করে, 'যেরকম কিল হবে, চিৎকারটাও হবে সেই রকম। রাম-কিল পড়লে চিৎকারটাও উঠ্‌বে রাম চিৎকার।'

'এক্সিলেন্ট! গজা, তুই একটা কুতুকুতু। একটা বুড়বুড়ু।'

সাজাহান ভাই আনন্দ প্রকাশ করে।

উৎসাহিত হয়ে গজা বলে, 'অবশ্য সেই সঙ্গে যে কিল দেবে তার হাতের থাবার ওজন ও যে কিল খাবে তার পিঠের চামড়াটাও হিসেব করতে হবে।'

'গজু, তুই একটা নখ কাটার নরুণ!' খুশি হয়ে গজাকে আদরের গালি দেয় সাজাহান ভাই। বলে, 'আচ্ছা, আমার হাতের থাবার ওয়েট কত হবে বলে তোর মনে হয়?'

হাতের থাবা মুঠি করে উঁচিয়ে ধরে সাজাহান ভাই। বলে, 'নে, তোরা সবাই দ্যাখ ... বল কত ওয়েট হবে।'

সবাই তীক্ষ্ণ চোখে সাজাহান ভাইয়ের হাতের থাবা পরখ করে। প্রদীপ বলে, 'আপনার হাতের থাবার ওজন হবে দুই সের ...'

সুনির্মল বাধা দিয়ে বলে, 'না, না ... সের হবে না ... ছটাক, দুই ছটাক!'

গজা বলে, 'ওজন হবে এক সের তিন ছটাক ...'

'হলো না ...'

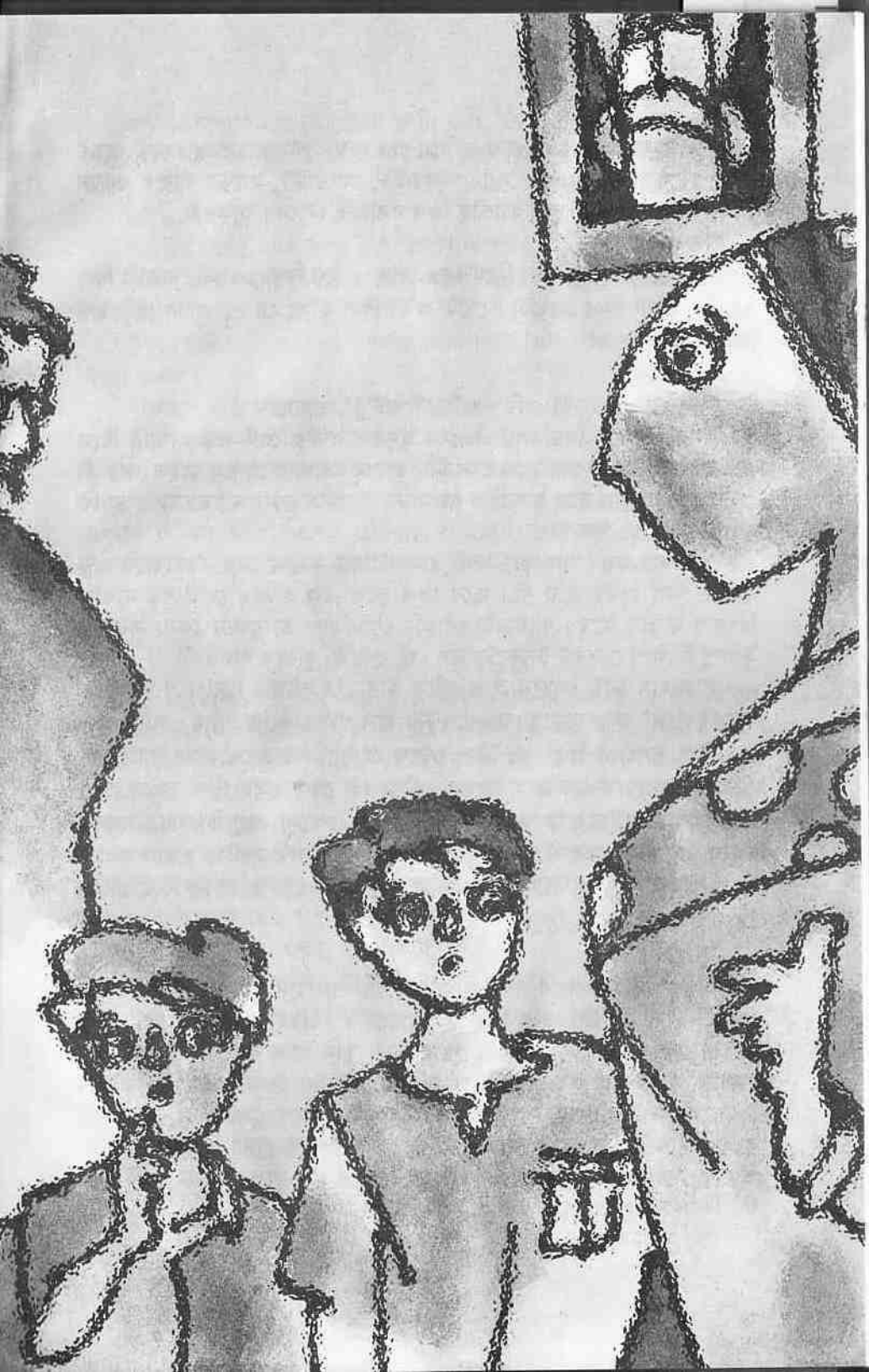

সাজাহান ভাই হাতের থাবা নামিয়ে রায় দেয়, 'আমার হাতের থাবার ওয়েট হলো ছ'পোয়া মানে দেড় সের। অলরাইট, অলরাইট, হাতের থাবার ওজনে তেমন কিছু যায় আসে না। স্ট্যান্ডার্ড কিল বসালেই চলবে। আকবর ...'

'জি ভাইয়া ...'

'পেপার আর পেন নে। নিয়েছিস? 'লেখ্ ... বড় কিল ৩০০টা, মাঝারি কিল ২৫০টা, ছোট কিল ৪৫০টা। মোট ক'টা কিল হলো রে ... ওয়ান থাউজেন্ড কিল, তাই না?'

'জি ভাইয়া।'

'অলরাইট, দিলু, বি রেডি। শাস্তির "পার্ট টু" শুরু হচ্ছে।'

শাস্তি হিসেবে দেড় সের ওজনের হাতের থাবার ছোট-বড়-মাঝারি মিলে এক হাজার কিল দেওয়া হচ্ছে শুনে দিলু প্রথমে অবজ্ঞায় হাসতে চাইল পরে কী ভেবে ফোঁস ফোঁস করে গজরাতে লাগল। এই ফোঁস ফোঁস গজরানো, কান্না কি রাগ কিছু বোঝা গেল না।

'নো ভয়-ডর। সাজাহান ভাই হাত উঠিয়ে সান্ত্বনা দেয়, 'তোমাকে এক হাজার কিল খেতে হবে না। তবে কিল বুঝে এক হাজার ছোট-বড়-মাঝারি চিৎকার ছাড়তে হবে। ব্যাপারটা বোঝনি বোধ হয়? তা বুঝবে কেন? সব তো ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কটের দল। হুঁ, শোনো, বুঝিয়ে বলছি।'

সাজাহান ভাই পেছনে হাত বেঁধে টান হয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'তোমাদের আগেই "সে" করা হয়েছে পানিশমেন্টটা হবে গলার স্বরের ওপর। আমি বলব বড় কিল, বলতেই পিঠে বড় কিল পড়লে যেমন চিৎকার বেরোনো স্বাভাবিক, তেমনি চিৎকার করতে হবে দিলুকে। ঠিক এই রকম ছোট কিল বললে ছোট চিৎকার ছাড়বে, মাঝারি বললে মাঝারি। আর শোনো, শুধু চিৎকার ছাড়লেই চলবে না। চিৎকারের সঙ্গে গলার স্বর দিয়ে যন্ত্রণার পরিমাণটাও প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ মারব না বটে, কিন্তু মারলে পরে যা যা ঘটা স্বাভাবিক সবই ঘটিয়ে দেখাতে হবে। বুঝেছ, দিলু?'

'বুঝেছি।'

দিলুর শুষ্ক মুখ দেখে একটু বুঝি দয়া হয় সাজাহান ভাইয়ের। বলে, 'ঠিক আছে, চিৎকার করার সময় কিছু "ল্যাংগোয়েজ" ব্যবহার করার "পারমিশান" দেওয়া গেল তোমাকে। চিৎকার করার সময় তুমি ইচ্ছে করলে "ও বাবা গো, গেলাম গো" "আর করব না, আর করব না", "গেছি রে বাবা গেছি"—এইসব "ল্যাংগোয়েজ" ব্যবহার করতে পারো। তবে মনে রেখো ছোট কিল বললে যদি বড় বা মাঝারি কিলের চিৎকার দিয়ে ওঠো বা কিল অনুযায়ী চিৎকার না দাও, তাহলে সেটাকে ভুল বলে গণ্য করা হবে এবং প্রতিটি ভুলের জন্যে একটি করে বড় কিলের চিৎকার যোগ করা হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

দিলু মাথা নাড়ে।

আকবর দিলুকে সাহস দেওয়ার জন্যে বলে, 'কোন-রকমে ম্যানেজ করে নে, দিলু। এর পরে আমরা যে প্রীতি-সম্মিলনী করব তাতে তোকে করব সভাপতি আর ...'

'এইও, স্টপ্ ...'

বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে ওঠে সাজাহান ভাই।

ধমক খেয়ে আকবর ক্লিন বলে বসে, 'আর সাজাহান ভাইকে প্রধান অতিথি।'

'দিলু, রেডি! ... আকবর, কাগজ কলম নিয়ে কিল আর চিৎকারের সংখ্যা লিখে রাখবি।'

সাজাহান ভাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'বড় কিল!'

অমনি প্রচণ্ড গগন-বিদারী চিৎকার ওঠে দিলুর। চিৎকার দিয়ে উঠেই মূর্ছিত। সাজাহান ভাই প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। পরে যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন ভেতরে ভেতরে দিলুর বুদ্ধিমত্তায় খুশি হয়ে ওঠে। আকবর আরো কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই চেঁচিয়ে সাজাহান ভাই বলে, 'স্টপ। দিলুকে "ফরগিভ" করা হলো। বেশ কায়দা জানে বালকটা!'

আট

সবকিছু ঠিকঠাক। সুনির্মল এক বাক্স বাংলা গানের রেকর্ড ও গ্রামোফোন জোগাড় করেছে। সাজাহান ভাই নিয়েছেন বাগাডুলি আর ক্যারমবোর্ড। প্রদীপ অতি কষ্টে তার বাবার বন্দুকটা নেওয়ার অনুমতি আদায় করেছে। তাঁবু, সতরঞ্জি ভাড়া করা হয়েছে কিবরিয়া অ্যান্ড সন্স থেকে। সবকিছু ঠিকঠাক, এই সময় গোল বাধাল পাড়ার জুয়েল। দিলুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল মোড়ের পান দোকানের কাছে। জুয়েল কোমরে দুহাত রেখে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। দিলুকে দেখে হাত ইশারায় কাছে ডাকল। দিলু কাছে যেতেই বলল, 'আমিও তোদের সঙ্গে যাব।'

দিলু তো অবাক। বলল, 'কোথায় যাবে?'

'তোরা যেখানে যাচ্ছিস সেখানে, আবার কোথায়? নে ন্যাকামি করিস না। কত চালে কত অন্ন তা ভাল করে আমার জানা আছে। খবর সবই আমি রাখি, বুঝলি?'

'কিন্তু, জুয়েল ভাই, আমরা তো পিকনিকে যাচ্ছি ক্লাব থেকে। তুমি ক্লাবের মেম্বার নও। তা ছাড়া ...'

'তা ছাড়া আবার কী?' জুয়েল খিঁচিয়ে ওঠে।

'তা ছাড়া যেতে হলে সাজাহান ভাই-এর অনুমতি লাগবে। তিনিই আমাদের লিডার কিনা।'

জুয়েল পাড়ার নামকরা মাস্তান ছেলে। হেন কুকীর্তি নেই যা সে করে নি। দু-একবার এজন্যে অপদস্থও হয়েছে। কিন্তু তাতে করে তার স্বভাব বদলায় নি। মাস্তানি বরং বেড়েছে। দিলুর কথা শুনে জুয়েলের চেহারা বাজপাখির মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। চোখ লাল করে বলল, 'লিডার আবার কে শুনি? আমিই তোদের লিডার। নে চল ...'

'চল, কিছু ছানার আমির্তি আর রসগোল্লা খেয়ে আসি। পকেট ফাঁকা মাঠ তো? কুছপরোয়া নেই। মিষ্টি খেতে পয়সা লাগে না। চল ...'

'কিন্তু ...'

'আবার কী হলো?'

'ভাবছি মিষ্টি খেতে গিয়ে দেরি করে না ফেলি। ক্লাব ঘরে ন'টার মধ্যে হাজির থাকার কথা আছে।'

'এখন তো মোটে সাড়ে আটটা। ন'টার মেলা দেরি আছে। মিষ্টি খেয়ে দিব্যি ফিরে আসা যাবে। তুই মিষ্টি খেতে চাস কী না আগে তাই বল্। মনে রাখিস—ইয়া বড় বড় আমির্তি ... ইয়া বড় বড় রস টসটসে ...'

কথা শেষ হবার আগেই দিলু বলল, 'আচ্ছা চলো।'

জুয়েল ভাই খুশি হয়। সেটা চেপে রেখে বলে, 'ভাবিস না তোকে খামোখা মিষ্টি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি। আসলে মিষ্টি খাওয়ার লোভ লাগছে আমারই। নেহাৎ দুজন ছাড়া যাওয়া চলে না তাই তোকে নিচ্ছি। ব্যাটা নটবর ঘোষ বোকার ধাড়ী। কিন্তু বলা যায় না তো। মোটঘাট বেঁধে যাওয়াই ভাল। তা তুই চালাক-চতুর আছিস ... তোকে দিয়ে খুব চলবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা দুজন নটবর ঘোষের মিষ্টির দোকানে এসে হাজির হয়। কাউন্টারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চশমার উপরে চোখ তুলে নটবর ঘোষ তাদের একবার দেখল। জুয়েল কেয়ারই করল না। বুক ফুলিয়ে সে গিয়ে বসল কোণের একটা টেবিলে। বলল, 'দিলু, তোর যা যা খেতে ইচ্ছে করে তা আমাকে শুধু ইশারায় একটু জানিয়ে দিবি, ব্রাদার। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে ইশারাই যথেষ্ট। নে, কী খাবি বল ...'

দিলু জুয়েলের এই উদার ব্যবহারে মুগ্ধ। সে শুধু বলল, 'অর্ডারটা তুমিই দাও, জুয়েল ভাই ...'

'ঠিক হ্যায়, আমিই দিচ্ছি ...'

বয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। জুলের দোকানের সব রকম মিষ্টির এক একটা করে দেওয়ার ঢালাও হুকুম দিল।

দিলু বলল, 'এত মিষ্টির অর্ডার না দিলেই হত, জুয়েল ভাই।'

'তাতে কী হয়েছে ...'

জুয়েল ভাই দারুণ উদার গলায় বলে, 'সামান্য দুটো মিষ্টি বই তো নয়। খা, পেট পুরে খা।'

মিষ্টির প্লেট ততক্ষণে টেবিলে এনে রাখা হয়েছে। মস্ত দুই থালার উপর থরে থরে আমির্তি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, কচুরি, মালাইকারি, জ্যাম, সন্দেশ, লবঙ্গ রাখা হয়েছে।

মিষ্টির পরিমাণ দেখে দিলু ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তু, জুয়েল ভাই, এত মিষ্টির টাকা ...'

'টাকা?' জুয়েল অম্লান হাসে, 'টাকা দিয়ে তো মিষ্টি খাচ্ছি না, ব্রাদার। কথা বাড়িয়ে ফায়দা নেই, শুরু কর। আমি হলাম গিয়ে ...'

জুয়েল মস্ত দেখে দুটো মালাইকারি এক সঙ্গে মুখে পুরে দেয়। তারপরের কথাগুলি মিষ্টি রসে ভিজে জড়িয়ে যায়। কিচ্ছু বোঝা যায় না।

কিছুক্ষণ মিষ্টি খাওয়া চলল নিঃশব্দে। দিলু তার ভাগের মিষ্টি খেতে পারছিল না। জুয়েল তা দেখে প্রথমে চটে গিয়েছিল দিলুর ওপর। তারপর নিজগুণে দিলুকে মাফ করে দিয়ে অবশিষ্ট মিষ্টিগুলো নিজেই খেল। খাওয়ার পর এক মিনিট এমন নিশ্চুপ ভঙ্গিতে ঠায় বসে রইল যে, দিলু রীতিমতো ভড়কে যায়। সে বলে, 'বেশি খেয়ে কী খারাপ লাগ্‌ছে, জুয়েল ভাই?'

'পাগল!'

জুয়েল মুখ খোলে, 'আমি ধরতে গেলে প্রায় খাই নি। সামান্য নাস্তা হয়েছে মাত্র।'

দিলু ভয়ে ভয়ে বলে, 'এইবার কী আরো মিষ্টির অর্ডার দেবে?'

'না, আরো খেলে ব্যাটা নটু সন্দেহ করবে। এখন আমি পেট ব্যথায় ছট্‌ফট্ করব, আর তুই চিৎকার করে সকলকে বলবি, মিষ্টির ভেতর কী একটা যেন ছিল, খেয়ে আমার এই দশা হয়েছে। নে, তৈরি হ, আমি হিক্কা তুলতে শুরু করি ...'

দিলু হতভম্ব হয়ে পড়ে। বুঝতে পারল জুয়েল ভাই এভাবেই টাকা ফাঁকি দিতে যাচ্ছে। সে কী করবে ভাবছে, এই সময় জুয়েল গোটা কয় হিক্কা তুলে 'ওয়াক', 'ওয়াক' করতে শুরু করল।

মুহূর্তেই কোত্থেকে এসে হাজির হয় নটবর ঘোষ। পেছনে জনাকয় ষণ্ডামার্কা লোক। জুয়েল বমি করার উপক্রম করতেই নটবর ঘোষ হাত নেড়ে বলে, 'ব্যস ব্যস ... হয়েছে। আর খলিফাগিরি করতে হবে না। চৌধুরী পাড়ার ছেলে তুমি, তোমার চালাকি আমরা বুঝি না ভেবেছ? এখন বমি করতে শুরু করবে, বলবে খারাপ মিষ্টি খেয়ে তোমার প্রাণ যায়। আর এভাবে মিষ্টি খেয়ে টাকা না দিয়ে ক্লিন বেরিয়ে যেতে চাইবে, তোমার ফেরেববাজি খুব বুঝি বাবা ... এজন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম ...'

হাঁ হয়ে যায় জুয়েল। নটবর ঘোষ কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে, 'আর একবার তুমি দোকানে এসে ঠিক এভাবেই মিষ্টি খেয়ে পেট ব্যথা করছে বলে হুলস্থুল কাণ্ড করেছিলে, মনে নেই? আজ আর ওসব চাল টিকবে না, হুঁ!'

কাঁদো কাঁদো হয়ে জুয়েল বলে, 'একবার এসেছিলাম সে তো এক বছর আগে। এক বছর আগের কথা এখনো আপনাদের মনে আছে?'

'তা আছে বৈকি', নটবর ঘাড় নেড়ে বলে, 'এইবার যখন তোমাকে পাওয়াই গেল, তখন ভাবছি দুবারের দামই এক সঙ্গে উশুল করে দিই ...'

নটবরের ষণ্ডামার্কা লোকগুলোর হাতের লাটির দিকে তাকিয়ে জুয়েল বলে, 'বিবেচনা করে দেখুন, একটা ভুল করে ফেলেছি। মারধর করলে কী সেটা শোধ হবে? মারধর করলে তো আর আপনার মিষ্টিগুলো বার করতে পারব না। হ্যাঁ, কী বলেন, মিষ্টিগুলো বার করতে পারব?'

ব্যাপার দেখে অনেকে এসে জড়ো হয়েছে আশপাশে। একজন ভুঁড়িওয়ালা দর্শক উপদেশ দিল, 'কিছু নরম গরম চাঁটি আর চাপড় মেরে ছোকরাকে ছেড়ে দিন, মশাই।'

একজন বলল, 'থানায় দিন, থানায়! মারামারির হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ কী?'

জুয়েল কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, 'থানায় দিয়েই বা কী লাভ, স্যার? থানা থেকে বেরিয়ে ধরুন চৌধুরী চাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমি তো দোকানে এসে হাঙ্গামা টাঙ্গামা করতে পারি। তারচে' স্যার, মাফ করে দিন। আর এমন করব না।'

নটবর কতক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা এ যাত্রা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনোদিন আমার দোকানে এসেছ তো হাঁটু ভেঙে দেব বলে রাখলাম। বুঝলে?'

জুয়েল বলে, 'পাগল হয়েছেন, আর আসব? যদি আসিই তাহলে এই বমির প্ল্যান নিয়ে আর না, স্যার। আপনাদের দোয়ায় যদি অন্য মতলব মাথায় গজায় তাহলে অন্য কথা। নে, চল, দিলু ...'

রাস্তায় বেরিয়ে পকেট থেকে গোটা দুই লং নিয়ে মুখে পোরে জুয়েল। লং চিবোতে চিবোতে বলে, 'একটু দেরিই হয়ে গেল। সোয়া ন'টা বাজে। চল ... তোদের ক্লাবে যাই।'

'জুয়েল ভাই,' দিলু বলতে শুরু করে, 'যদি পিকনিকে যেতেই চাও তাহলে ক্লাবে গিয়ে সাজাহান ভাইয়ের অনুমতি নাও।'

'থাম, থাম হয়েছে। পিকনিকে যাব আমি আর অনুমতি নিতে হবে সাজাহান ভাইয়ের কাছে। সাজাহান ভাই কে শুনি? ইচ্ছা করে জুয়েল অজ্ঞান সাজে।

'বাঃ' দিলু বলে, 'সাজাহান ভাইকে তুমি বুঝি চেনো না! চৌধুরী পাড়ায় আছ, আর চৌধুরী পাড়ার সাজাহান ভাইকে চেনো না, এটা কথা হলো!'

হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনি। সাজাহান ভাইকে খুব চিনি। কাজ কম্মো কিছু করে না, আড্ডাবাজ সাজাহান ভাইকে চৌধুরী পাড়ার লাইট পোস্টটা পর্যন্ত চেনে! ও আবার একটা লোক হলো নাকি? যা এখন থেকে আমিই তোদের লিডার। আর কোন কথা বলবি না, চুপ।'

জুয়েল বয়সে দিলুর চেয়ে বছর পাঁচেক বড়, শরীরে স্বাস্থ্যে তাগড়া পুরুষ্টু। গত বছর বক্সিং-এ সেমি ফাইনালে হেরে গিয়েছিল। তবে রকবাজি আর খামোকা গোলমাল পাকানোয় এ শহরে তার জুড়ি নেই বললেই হয়। ক্লাবঘরে

এসে দিলু যখন আমাদের অর্থাৎ গজা, প্রদীপ, সুনির্মল, আকবর আর আমাকে খবরটা দিল যে পিকনিকে আমাদের সঙ্গে জুয়েল ভাইও যাচ্ছে, তখন বলতে কী মন খারাপ হয়ে গেল সবার।

এমন গোলমেলে ছেলে জুয়েল ভাই, সে গেলেই হয়েছে, পিকনিক একদম মাটি।

সাজাহান ভাই কতক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'যেতে চাইছে যাক না।'

জুয়েল চেঁচিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, তা তো যাবই। এই সবাইকে বলে রাখছি, আমি হলাম তোদের একমাত্র লিডার। আমার কথা ছাড়া আর কারুও কথা শুনবি না।'

বলে প্রায় লাফিয়ে গিয়ে প্রদীপের বন্দুকটার ওপর পড়ল। বন্দুকটা হাতে নিয়ে প্রদীপকে হুকুম দেয়, 'গুলির বাক্স দে ...'

ভয়ে ভয়ে প্রদীপ গুলির বাক্স জুয়েলের হাতে তুলে দেয়। জুয়েল বাক্সটা হাতস্থ করে বলে, 'বাস দেখছি রেডি আছে ... বেশ, এখন মালপত্র উঠাতে শুরু কর। সাজাহান ভাই, (জুয়েল সাজাহান ভাইকে ভাই বলল দেখে আমরা দারুণ অবাক হয়ে গেলাম) তুমি একটা গান গাও তো ...'

সাজাহান ভাই গম্ভীর গলায় বলে, 'আমি সিংগিং জানি না ...'

'বেশ, দুপুরবেলা খাওয়ার সময় তোমার বরাদ্দ মাংসের এক টুকরো বিয়োগ করা হলো ...'

জুয়েল তাকায় গজার দিকে, 'গজা।'

'কী?'

'তুই অমন দাঁত কিড়মিড় করে কী ভাবছিস?'

'ভাবছি একটা ঘুসি মেরে তোমার নাকের চেহারাটা খারাপ করে দিলে কেমন হয়।'

'এই তাহলে ভাবছিস্? বেশ, তোর খাওয়া বন্ধ। প্রদীপ ...'

প্রদীপ আমার পেছন দিয়ে সট্‌কে পড়তে চাইছিল। ধরা পড়ে গিয়ে একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। তার বোধহয় ধারণা ছিল যা ছেলে জুয়েল, পালানোর চেষ্টার অপরাধে তাকে গুলি করেই বসে কী না কে জানে?

জুয়েল সত্যি সত্যি গুলি ভরছিল বন্ধুকে। প্রদীপ কাঁদছে দেখে মাথা নেড়ে বলে, 'কান্নাকাটি করে কী হবে? অপরাধ একটা করেছিস। আমার বিনা অনুমতিতে পালাতে চাইছিস, শাস্তি তোকে দেওয়া হবে। আজ দুপুরবেলার খাবার থেকে তোর ডাল বাদ দেওয়া হলো।'

কথাটা বলে উসখুস করতে থাকে জুয়েল। শাস্তিটা বোধহয় পছন্দ হয় নি। একটু থেমে কী ভেবে বলে, 'না, তোর শাস্তি আরো গুরুতর হওয়া দরকার। যা, দুপুরবেলার খাওয়া থেকে তোর ভাত বাদ দেওয়া হলো, তুই শুধু তরকারি খাবি।'

এইভাবে কারো ভাত বিয়োগ করে, কারো খাওয়া বন্ধ করে, কারো জন্য লবণ ছাড়া তরকারি বরাদ্দ করে জুয়েল ক্ষান্ত হয়। বাসে মালপত্র তখন উঠানো হয়ে গেছে। সাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে সবার ফিসফিস আলাপ চলছে। কেউ জুয়েলের দিকে ফিরে চাইছে না। চুপ করে থাকা জুয়েলের স্বভাব না। এই অবস্থা দেখে হাঁক পেড়ে সে বলল, 'এর কী মানে শুনি, অ্যাঁ? এতগুলি কথা বললাম আমি আর কেউ একজন একটি কথাও বলল না আমার সঙ্গে! এমন ধারা ব্যবহার করলে খেপে যাব কিন্তু বলে রাখলাম।'

এই ধমকেও লাভ হলো না কিছু। সবাই বাসে যে যার আসনে চুপচাপ বসে রইল। জুয়েল তখন ঘোষণা করে, 'আমার সঙ্গে যে কথা বলবে, প্রতিটা কথার জন্য তাকে ফিরে এসে একটা করে পান্তুয়া খাওয়াব।'

কী একটা নির্দেশ দিল বুঝি সাজাহান ভাই, বাস চল্‌তে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে যা বোঝার তা বুঝে গেছে জুয়েল। সে কিনা খারাপ ছেলে, রকবাজ আর লাট্টু, তাই কেউ তাকে পাত্তা দিতে চায় না, আমল দিতে চায় না। এই মৌসুমে কত ছেলে পিকনিকে গেল চৌধুরী পাড়া থেকে। কিন্তু খারাপ ছেলে বলে সবাই জুয়েলকে সযত্নে পরিহার করেছে। দিলুদের সঙ্গে বলতে গেলে জোর করেই এসেছে, এখানেও সেই একই ব্যাপার।

সে উঠে দাঁড়ায় হাতল ধরে। আশ্চর্য রকম শান্ত আর সুস্থির তার মুখ। চোখ দুটি পানিতে সজল। ভদ্র গলায় ড্রাইভারকে বলে, 'এই, ড্রাইভার সাহেব, রোখো। আমি নেমে চলে যাই ...'

সাজাহান ভাই দিলুর দিকে তাকায়। দিলু বলে, 'পিকনিকে যাবে না?'

'তোরা যা। আমাকে সাথে করে নিয়ে গেলে পিকনিকটাই মাটি হবে তোদের। সত্যি আমি আগে বুঝি নি আমি এতটা খারাপ। কেউ আমাকে চায় না, ভালবাসে না ... আমি একটা পাজী ছেলে, রকবাজ ছেলে, লাট্টু ছেলে ...'

জুয়েলের গলার স্বর প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে। বলে, 'ড্রাইভার সাহেব, রোখো ... এখানেই থামো। আমি নেমে যাচ্ছি।'

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছিল। জুয়েল হাতল ধরে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। বন্দুকটা ফিরিয়ে দেয় প্রদীপের হাতে। বলে, 'কিছু মনে করিস্ না। বন্দুক দিয়ে আসলে খামোকা তোদের ভয় দেখাচ্ছিলাম। আচ্ছা চলি।'

জুয়েল নেমে পড়তে যায়। হঠাৎ সাজাহান ভাই চড়া গলায় বলে, 'এই কোথায় "গো" করছিস শুনি?'

জুয়েল বলে, 'তাহলে কি আমাকে থাকতে বলছ, সাজাহান ভাই?'

জবাবে সাজাহান ভাই শুধু বলল, 'ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট কোথাকার ...'

'কী বললে?'

'বললাম, তুই একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গরুর গাড়ি। একটা পোকা ধরা টক আম। পা, পা, ঝা কোথাকার। উঠে আয় বলছি!'

বাস থেমে দাঁড়িয়েছিল গোলকুণ্ডার রাস্তায়। সাজাহান ভাই বলে, 'ড্রাইভার, চালাও। কোথাও "স্টপ" করবে না।'

গাড়ি চল্‌তে শুরু করে। জুয়েল ঝুঁকে পড়ে দিলুর দিকে। 'কী রে, দিলু, সাজাহান ভাই আমাকে মাফ করেছে?'

'তা কিছু বোঝা যায় নি। তবে তোমাকে বোধ হয় মাফ করা হবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'সাজাহান ভাইকে দেখে আমরা সব বুঝতে পারি। অপেক্ষা করো।'

কণ্টকিত জুয়েল তাকিয়ে রইল সাজাহান ভাইয়ের দিকে। গাড়ি ততক্ষণে ছুটে চলেছে মধুপুরের দিকে।

নয়

বেলা এগারোটায় আমরা মধুপুর গড়ে গিয়ে পৌছলাম। বাস রেখে দেওয়া হলো সরকারি ডাকবাংলোয় দারোয়ান জুম্মা মিঞার কাছে। সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা এখানে এসেছি। আমরা তিনদিন অরণ্য জীবনযাপন করতে চাই, বাড়ি ফেরার সময় সাথে নিয়ে যেতে চাই অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ।

বাস রেখে দেওয়াতে মালপত্রের মোট নিজেদেরই বইতে হলো। সাথের মাল-পত্র নেহাৎ কম বলা চলে না। খাবার, পানির বড় ব্যাগ, হাঁড়িকুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, তাঁবু, বাজার-সওদা, একটা কেরোসিনের চুল্লি, গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্স, টুকিটাকি আরো অনেক কিছু মালপত্র নিয়ে আমরা অরণ্যের গভীরে ঢুকলাম। শেষ পর্যন্ত চমৎকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে ঘন গাছপালা। সারি সারি শাল, গজারি, শিশু, মহুয়া আর বাঁশ ঝাড়। এখানে ওখানে উঁচু নিচু লাল মাটির টিলা। লাল মাটি ধুয়ে একটা ছোট্ট নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে। জঙ্গলের ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানেই তাঁবু খাটানো ঠিক হলো। আমাদের সঙ্গে ছিল ড্রাইভার আলী মিঞা। সে তাঁবু খাটানোর ব্যাপারে আমাদের খুব সাহায্য করল।

খিদেয় আমাদের পেট চোঁ চোঁ করছিল। সাজাহান ভাই গম্ভীর মুখে সকলের মধ্যে সিদ্ধ ডিম, কেক আর কলা ভাগ করে দিল। আলী মিঞার ভাগে ডিম আর কলা বেশি পড়ল। সে নাস্তা সেরে চলে গেল ডাকবাংলোর দিকে। সেখানে থেকে বাস নিয়ে ফিরে যাবে শহরে। তিনদিন পর বাস নিয়ে আবার সে আসবে। আমরা আলী মিঞাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। আমাদের মনে হলো শহরের সঙ্গে সর্বশেষ সম্পর্কটুকুও যেন চলে গেল ড্রাইভার আলী মিঞার সঙ্গে।

আমাদের চুপচাপ ভাবভঙ্গি দেখে সাজাহান ভাই রীতিমত খেপে গেল। গম্ভীর মুখে বলল, 'একেই বলে ঘরকুনো বাঙালি। "থ্রি ডেইজের" জন্য "ফরেস্টে" এসেছি, এতেই গলা শুকিয়ে উড। ইলিম্পু ডিলিম্পু য়েস্‌কট টস্‌কট কাঁহেকা!'

জুয়েল বলল, 'আমরা ভয় পেয়েছি? কখ্খনো না। একটু কী বলে মন খারাপ হয়েছে বটে তবে ভয় যে পাই নি তার পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। কী বলিস, গজা?'

'নিশ্চয়ই।'

গজা এ বিষয়ে জুয়েলের সঙ্গে একাত্মা। একটু আগে জুয়েলের সঙ্গে আমাদের যে মনকষাকষি চলেছিল এখন কারো মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। সবাই সাহসের পরীক্ষা দিতে রাজি হয়ে গেল জুয়েলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

আকবর বলে, 'বলো। বলো না কী করতে হবে, সাজাহান ভাই, আমরা চৌধুরী পাড়ার ছেলে, আমাদের অসাধ্য যে কিছু নেই তা দেখিয়ে দিই।'

'হ্যাঁ, বলো,' সুনির্মল সায় দেয়, সাজাহান ভায়ের গলার স্বর নকল করে বলে, '"সিম্পলি" অর্ডার দিয়ে দেখো। ভগবানের আশীর্বাদে ...'

সাজাহান ভাই খুশি হয়ে বলে, 'বেশ, বেশ এই তো চাই। না রে, কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। তোদের চোখ-মুখ দেখেই আমি সব "আন্ডারস্ট্যান্ড" করতে পারছি। আর কিছু না, তোরা আমাকে ১৯৪৭ সালের একটা অর্ডিনারি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিস। তখন আমার বয়েস ছিল এই ধর ষোলো-সতেরো। আমাকে ছেলে-মানুষ পেয়ে "টাইগার"টা খুব লম্ফঝম্প করছিল। শেষ পর্যন্ত কী আর করি, রেগে মেগে ...'

দিলু বলে, 'তার মানে ১৯৪৭ সালে আপনি একটা বাঘ ...'

সাতিশয় লজ্জিত হয়ে সাজাহান ভাই বলে, 'সেই কলঙ্কের কথা তুলিস না, দিলু। ভেবেছিলাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার বুঝি "কিল" করলাম। পরে দেখি একটা "অর্ডিনারি টাইপের টাইগার"। মেজাজই খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। "ক্লিয়ার" মনে আছে, সেদিন রাগ করে বিকেলের চা খাই নি। বন্দুক ছাড়া অনেক রাত সুন্দরবনে 'স্ট্রল' করে বেড়িয়েছিলাম। আর কিছু না। রাগে, দুঃখে।'

সাজাহান ভাই তাহলে বাঘ মেরেছিলেন। আমরা বিস্ময়ে, গর্বে, আনন্দে সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। সাজাহান ভাই বলে, 'এসব অর্ডিনারি ঘটনা "গো" করতে দে। আসল কথা হলো সাহস। হ্যাঁ, তোরা কেউ সাহস "লুজ" করবি না কখনো। তাহলে আমি অত্যন্ত "সরি" হব। নে, এইবার "লাঞ্চের" ব্যবস্থা কর। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোদের সে করতে চাই।'

সাজাহান ভাই নিস্তব্ধ হলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কথাটা হলো তোদের "লিডার" কে?'

বুঝলাম জুয়েলের দুর্ব্যবহার সাজাহান ভাই এখনো ভুলতে পারে নি। কথাটা শুনে সবচে দুঃখিত ও লজ্জিত হলো জুয়েল নিজে। সে ইতিমধ্যে নিজের অতীত আচরণের জন্যে খুব অনুতপ্ত। কেউ কিছু বলার আগে জুয়েলই বলল, 'কেন, তুমিই আমাদের লিডার, সাজাহান ভাই।'

'নো, নো, আমি তোদের লিডার নই। আমি হলাম গিয়ে তোদের "বিগ ব্রাদার", বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস বড় ভাই। লিডার আমরা একজন দল থেকে "ব্রিং আউট" করতে চাই।'

আমরা সবাই দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে আছি দেখে সাজাহান ভাই বিরক্ত হয়ে বলে, 'ধ্যাৎ! আমি এসব কথা "মাইন্ড" করে বলছি না। লিডার সম্পর্কে তোদের কোন আইডিয়াই নেই। শোন আমি একটা প্রস্তাব দিই। সারাদিনের মধ্যে যে সবচে উদ্ভট আর মজার গল্প "টেল" করবে, সেই হবে পরের দিনের জন্যে লিডার। এইভাবে "ডেইলি" আমরা লিডার ঠিক করব। বুঝলি?'

আমরা সবাই তক্ষুণি রাজি। বেশ মজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! সাজাহান ভাই বলল, 'আমিও তোদের সঙ্গে "সিরিয়াসলি কমপিট" করব। মনে করিস না বিনা যোগ্যতায় "লিডারশিপ" মেরে দিতে পারবি!'

আমাদের অরণ্য-জীবন শুরু হয়ে গেল। আপাতত আমাদের লিডার নেই, সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই নিজের নিজের লিডার। আমাদের কাজ আমরা ভাগ করে নিলাম। দুপুরের খাওয়া সেরে উঠতে উঠতে বেলা সাড়ে তিনটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ক'জন নদীর তীর ধরে বেড়াতে গেলাম। আমরা মানে আমি, দিলু, গজা আর সুনির্মল। চারদিক নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। এখানে-সেখানে সোনার পাতের মতো রোদের টুকরো। আমাদের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ধূসর রঙের তিতির ঝোপঝাড় ঝাপ্টে দূরে পালিয়ে গেল। গাছের পাতায় পাতায় ফাল্গুন মাসের প্রথম হাওয়া হু হু করছে।

বাইরে থেকে বেড়িয়ে যখন তাঁবুতে ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। পশ্চিম দিক রক্তবর্ণ। ঝিঁঝি ডাক্ছে। পাগল হাওয়া বইছে চারদিকে।

জুয়েল নতুন দুটি ছেলেকে নিয়ে রাত্রি বেলাকার রান্নার উদ্যোগ করছে। জুয়েল বেশ ভাল রাঁধতে পারে। তার এই গুণটা খুব কাজে লাগছে। দুপুরবেলা জুয়েলের হাতের রান্না খেয়ে সাজাহান ভাই তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল রাত ন'টার দিকে। তাঁবুর বাইরে মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। এখন গল্প বলার আসর। গল্প হওয়া চাই উদ্ভট। কিন্তু সাজাহান ভাই সাবধান করে দিল, শুধু উদ্ভট হলেই চলবে না, সত্যি গল্প হওয়া চাই।

গল্প বলার তালিকায় মোট তিনজন নাম লেখাল। সুনির্মল, গজা আর প্রদীপ। দিলুকে গল্প বলার জন্য সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু দিলু কিছুতেই রাজি হলো না। সে বলল, 'আমি ডেপুটি লিডার হতে চাই। লিডার হব না।'

সাজাহান ভাই বলল, 'ডেপুটি লিডার আমরা ভোটে ঠিক করব। কী বলিস, জুয়েল?'

জুয়েল বলল, 'সেই ভাল। নিয়ম করে দাও ভোট নেওয়া হবে গোপনে।'

'বহুত আচ্ছা।' আকবর বলে, 'এইবার গল্প শুরু হোক।'

সাজাহান ভাই বলল, 'সুনির্মল স্টার্ট কর।'

সুনির্মল শুরু করল। 'একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলছি, দু-একটা ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি অবশ্য হতে পারে। সে যাকগে ... ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর। পরীক্ষা শেষ, মামা চিঠি লিখলেন যেতে। মামাবাড়ি যেতে আমারও খুব ইচ্ছা করছিল।

একদিন মামাবাড়ি যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম রওনা হলাম এরোপ্লেনে। প্লেনের ড্রাইভার রবিদাস খুব মজার লোক। সে প্লেন চালাতে লাগল আর গান গাইতে লাগল। মাঝপথে প্লেন থামিয়ে গঞ্জ থেকে এক সের গরম জিলাপি আর আধসের কদমা কিনে নিলাম। মামাবাড়ি গিয়ে পৌছলাম সন্ধ্যার দিকে। পৌছে যেতাম বিকালবেলায়। কিন্তু একটা বলদ আবার খোঁড়া ছিল। বলদটা কেনা হয়েছিল তেলিদের কাছ থেকে। তেলিরা আবার ঘোড়ার বদলে সময় সময় বলদ দিয়েই ঘানি টানে কিনা ...'

গল্প শুনে সাজাহান ভাই তো মহা খেপে গেল। এক ধমকে সুনির্মলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'পট্টি মারার আর "প্লেস" পাস না হতভাগা? এরোপ্লেন দিয়ে তুই মামা-বাড়ি করেছিলি আর তাই আমরা "বিলিভ" করব? পুরানো ক্যালেন্ডার কোথাকার ...'

'বাঃ, গুলপট্টি মারলাম কিসে? আমি তো ঠিকই বলছি।' সুনির্মল একেবারে সত্যের অবতার।

'চুপ কর, ভেজাল পাউডারের "মিল্ক" কোথাকার!' সাজাহান ভাই একেবারে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

'ওহ্‌হো ...' সুনির্মল এতক্ষণে সংবিত ফিরে পায়। বলে, 'একটা কথা তোমাদের খুলে বলা হয় নি। ওটা আমার ভুল হয়েছে বলতে পারো। আসলে গাড়োয়ান রবিদাসের গরুর গাড়িটাকে মজা করে আমরা এরোপ্লেন বলে থাকি। তাহলে কথাটা দাঁড়াল গত বছর গরুর গাড়িতে করে আমি মামাবাড়ি গিয়েছিলাম।'

এবার গজার পালা। সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'মামাবাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই খুব মজার মজার খাবার খেয়েছিলি?'

'সে আর বলতে ...' সুনির্মল ভোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে, 'দুইবেলা ঘি-দুধ, রাবড়ি সন্দেশ ...'

'কিন্তু আমি যা খেয়েছিলাম তা পৃথিবীতে কেউ খেয়েছে কিনা সন্দেহ।'

গজা নড়েচড়ে বসে গল্প বলতে শুরু করল, 'আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা বাজি থেকে। আমার মামাতো ভাই সোহেলের সঙ্গে সব সময়ই এটা ওটা নিয়ে জেদাজেদি হয়। একদিন সোহেল বলল : তুই দশ সের রসগোল্লা খেতে পারবি, গজা? আমি বললাম : দশ সের? ওরে বাবা, অত পারব না। পাঁচ সের নাগাদ পারব। মিটিমিটি হেসে সোহেল বলল : তা তুই যে কোন কর্মের নস, তা আমি জানি। গজা, তোর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়।'

'সোহেলের বিদ্রূপ শুনে মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম : বেশ খাব দশ সের রসগোল্লা। দশ সের না, এক মন খাব, না, এক মন কম হলো আমি দশ মন রসগোল্লা খাব। খেয়ে তোকে দেখিয়ে দেব। আন্ দেখি দশ মন রসগোল্লা।'

'সোহেল তেমনি শয়তানি হাসি হেসে বলল : তোর একটা গুণ আছে, গজা। গুণটা হলো, তুই কথায় একেবারে দুনিয়া উল্টে ফেলিস। কিন্তু কাজের বেলায় নিজেই উল্টে যাস।'

'আমি বললাম : বেশ, তাহলে কাজ দিয়েই আমার কথা প্রমাণ করছি। চল মিষ্টির দোকানে যাই।'

'সোহেল রাজি হয়ে আমার সঙ্গে মিষ্টির দোকানে গেল। আমি একটুও কথা না বলে রসগোল্লা খেতে শুরু করলাম। প্রথম খেলাম দশ মন। চারদিকে ভিড় জমে উঠল। মিষ্টিওয়ালা তাজ্জব বনে গেল। ব্যাপার দেখে সোহেলও ঘাবড়ে গেছে। সে বলল : আর খাসনে, গজা। অসুখ করে মরবি। আমি বললাম : তা হয় না। দশ মন খেয়েছি, এবার আরো কিছু খেয়ে একটা রেকর্ড করতে চাই।'

সবাই হাঁ করে গল্প শুনছে। দিলু বলল, 'তা, তুই রেকর্ড করেছিলি?'

'করেছিলাম বৈকি। সেবার দশ মন রসগোল্লার ওপর আরো পঞ্চাশ মন রসগোল্লা খেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ওটাই খাওয়ার পরিমাণের দিক দিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।'

'আমাদের বিশ্বাস,' আকবর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তোর মাথার সব ক'টা বল্টু খুলে কোথাও পড়ে গেছে। তা নইলে ষাট মন রসগোল্লা খাওয়ার গল্প আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।'

গজা দুঃখিত হয়ে বলে, 'বিশ্বাস করা না করা তোদের ইচ্ছে। আমি কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলছি।'

'তোকে "ম্যাড ডগে" কামড়ায় নি তো, গজা?'

সাজাহান ভাই সতর্কভাবে তাকায় গজার দিকে। 'পাগল অনেক রকম 'সি' করেছি, কিন্তু ব্রাদার, তোর মতো এমন জাত পাগল কোথাও দেখি নি। তোকে আমরা আর কী বলি! আজ মোহাম্মদ তোগলক বেঁচে থাকলে তিনি তোর ভ্যালু বুঝতে পারতেন।'

গজা বলে, 'আমি আবার বলছি, এটা সত্যি ঘটনা।'

'সত্যি ঘটনা?'

'আলবত সত্যি ঘটনা। স্বপ্ন দেখা কি কি মিথ্যে ব্যাপার বলতে চাও? আমি একদিন স্বপ্নে ষাট মন রসগোল্লা খেয়েছিলাম। কী হলো এখন?'

প্রদীপ কেন যেন হাসতে লাগল গজার কথা শুনে। হাসি কিছুতেই থামে না। দিলু বলল, 'অমন করে হাসছিস কেন, প্রদীপ? কী হয়েছে?'

'খাওয়ার কথা শুনে হাসছি। ভুল করে আমিও একদিন খেয়ে বসেছিলাম কিনা। তবে গজা ভাইয়ের মতো অতটা নয়, সামান্য।'

'স্বপ্নে খেয়েছিলি?'

'না না স্বপ্নে খাব কেন?' প্রদীপ আপত্তি করে, তাকায় সাজাহান ভাইয়ের দিকে। বলে, 'গল্পটা তাহলে বলি, সাজাহান ভাই। অপরাধ নেবেন না কিন্তু। আমি তো ইচ্ছে করে খাই নি, ভুল করে খেয়েছিলাম।'

'"সে" করতে শুরু কর, বাপু। দেখি কোথাকার "ওয়াটার" কোথায় গিয়ে "স্ট্যান্ড" করে ...' সাজাহান ভাই তাড়া দেয়।

প্রদীপ বলে : 'ক'দিন আগের ব্যাপার। রাত্রিবেলা দাদুর ঘরে শুতে হয়েছিল। দাদু কবিরাজী করেন, বুড়ো মানুষ। আমি যখন শুতে গেলাম তখন দাদু পাশের ঘরে মা আর ছোট পিসির সঙ্গে গল্প করছেন। খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু শুতে গিয়ে

দেখলাম বিছানাটা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার তখন খুব রাগ হলো। আমি দরজা খুলে বিছানাটার পিছু নিলাম। বেরিয়ে বাগানে এসে দেখলাম তাজ্জব কাণ্ড। হাজী মোহাম্মদ মুহসিন আর অংকের পণ্ডিত যাদব চক্রবর্তী বসে আছেন বাগানের বেঞ্চে। আমাকে দেখে হাজী মোহাম্মদ মুহসিন বললেন : তুমি একটা অংক করতে পারবে, প্রদীপ? আমি বললাম : কী অংক? যাদব চক্রবর্তী উত্তর দিলেন। বললেন : অংকটা খুব সহজ। কিউবের ফর্মুলা দিয়ে এশিয়া মহাদেশ ভাগ করতে হবে। আমি অংক করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় ব্যাবিলনের রাজা সলোমন এসে হাজির হলেন। বললেন : প্রদীপ, রাস্তায় আমার রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। তোমার কাছে এক টাকার ভাংতি হবে? আমি বললাম : না, আমার কাছে হবে না। দাদুর কাছে হতে পারে। দাঁড়ান দাদুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি।

'রাজা সলোমন বললেন : থাক পয়সা লাগবে না। এসো আমরা ক্রিকেট খেলা দেখি। চোখ ফিরিয়ে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। আমাদের বাগানে ক্রিকেট খেলা চলছে। দক্ষিণ দিক থেকে বল করছেন ফজল মাহমুদ। ব্যাট করছেন শিল্প জয়নুল আবেদিন। উইকেট কিপারের দিকে তাকিয়ে আমি আরো অবাক। উইকেট কিপিং করছেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। ফিল্ডিং দিচ্ছেন হানিফ মোহাম্মদ, হাটন, কবি উইলিয়ম শেক্সপিয়ার আর হাতেম তাই। অন্য পাশে ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্বয়ং আমি। খুব খেলা হচ্ছিল। আমি খুব পিটিয়ে খেলছিলাম, প্রায় ওভারেই চারটা পাঁচটা ছয়ের মার। হঠাৎ মাঠে এসে হাজির হলেন যাদব চক্রবর্তী। গম্ভীর মুখে বললেন : হোম টাস্কের অংক ক'টা করেছ? আমি বললাম : আমি অংক করতে চাই না। আমি ক্রিকেট খেলব আর ছবি আঁকব। শিল্পী জয়নুল আবেদিন বললেন : হাতটা কখনো নষ্ট কোরো না, প্রদীপ।

'হাতেম তাই বললেন : 'আমি এখন একটা ক্যাচ ধরব। একজন আম্পায়ার গান করতে করতে বলল : খেলা শেষ হয়েছে, এখন শুতে যাও, প্রদীপ। আম্পায়ারের গান শুনে আমার বিছানাটার কথা মনে পড়ল। বিছানাটা পালিয়ে গেছে, আমি শোব কোথায়? হাতেম তাই বললেন : বিছানা পালিয়ে গেছে তাতে কী হয়েছে। হাজী মোহাম্মদ মুহসিন বললেন : হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে। তোমাকে আমি বিছানাটার কাছে নিয়ে যাব। আমি বললাম : তাহলে খুবই ভাল হয়। আমার ঘুম পাচ্ছে। বিছানা নেই বলে শুতে পারছি না। আমার সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল আমার। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন দাদু। তাঁর টেকো মাথাটা বিকট রকম বড় দেখাচ্ছিল। দাদু আমার হাত ধরতে চাইলেন। আমি দিলাম না। বললাম : দাদু, আমি কাল সকালবেলা হোম-টাস্ক করব। দোহাই আপনার, দয়া করে রাগ করবেন না। দাদু যেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন : তাতে কী হয়েছে প্রদীপ, আমিও তোমার সাথে এক ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, হোম-টাস্কের অংক না হয় কাল সকাল বেলাই করব। দাদুর কথা শুনে শেরে বাংলা ফজলুল হক আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার খুব হাসতে লাগলেন।

'আমার কিন্তু "ক্রাই" করতে ইচ্ছে করছে ...'

সাজাহান ভাই গোল হয়ে বসল। বিগলিত গলায় বলল, 'তোর "ট্রাঙ্ক মিল" দেখে আমার "সিম্পলি" ক্রাই করতে ইচ্ছে করছে যে ...'

জুয়েল বলল, ' "ট্রাঙ্ক মিল" শব্দটার মানে কী, সাজাহান ভাই?'

'মানে তোর "হেড"—মুণ্ডু ...' সাজাহান ভাই রাগ করে, 'ইংরেজি কি তোরা কিছুতেই "লার্ন" করবি না, জুয়েল? ট্রাঙ্ক মানে কাণ্ড আর মিল মানে বাংলায় কারখানা, —সব মিলিয়ে হলো কাণ্ড কারখানা, এটুকু বুঝতে পারছিস না পা পা ঝা কোথাকার?'

প্রদীপ বলে, 'আমি কিন্তু শব্দটার অর্থ বুঝেছিলাম, সাজাহান ভাই।'

'এই কথা থাক। পরে কী হলো তাই শুনি ...' দিলু রায় দেয়।

সাজাহান ভাই বলে, 'না না ... শেরে বাংলা ফজলুল হক আর উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ার লাফিং করতে লাগলেন ওই পর্যন্ত থাকে। পরে কী হলো শোনার চেয়ে আগে কী হয়েছিল তা-ই বরং "হিয়ার" করা যাক।'

প্রদীপ বলল, 'দাদুর টেবিল থেকে এক গ্লাস পানি খেয়েছিলাম। খেয়েছিলাম সামান্যই, তবে ...'

'এক গ্লাস পানি খেয়েই এই অবস্থা ...'

'পানিতে ছিল দাদুর কবিরাজী বড়ির গুঁড়ো।' প্রদীপ রহস্য ভেদ করে। বলে, 'সে রাতে বাগান থেকে আমাকে দাদুই ধরে এনেছিলেন। এখন তিনি লজ্জায় কবিরাজী করাই ছেড়ে দিয়েছেন, রোজ রাতে সিদ্ধিও খান না ...'

'তার মানে তুই সিদ্ধি "ইট" করেছিলি?' সাজাহান ভাই প্রায় আর্তনাদ করে।

'হ্যাঁ করেছিলাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।' প্রদীপ উৎসাহের সঙ্গে জানায়।

দারুণ গম্ভীর হয়ে যায় সাজাহান ভাই। দিলুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'প্রদীপকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তিটা হলো বাঁ হাতের "ওল্ড" আঙুল ছাড়া বাকি চারটে আঙুলে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট তাকে ঝুলে থাকতে হবে সামনের ওই জাম গাছের ডালে। নিয়ে যা প্রদীপকে।'

প্রদীপ হাউমাউ করে বলে, 'বাঃ, বললাম তো ভুল হয়েছিল। তার জন্যে আবার শাস্তি কিসের?'

'ভুল হয়েছিল বলেই তো "ফোর ফিঙ্গারে" "হ্যাঙ্গিং" এর শাস্তি দেওয়া হলো। "নলেজ" থাকতে অর্থাৎ বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস জ্ঞান থাকা অবস্থা, সেই অবস্থায় সিদ্ধি ইট করলে তো মাথায় "ব্রিক ব্রেক" করতাম।'

প্রদীপ নিরুপায় হয়ে বলে, "ধরো যদি বলি আমি সিদ্ধি খাই নি। গল্পটা বানিয়ে বলছি, তাহলে।'

'তাহলে "পানিশমেন্ট" একটু অন্য রকম হবে। সে অবস্থায় তুই দুহাত দিয়েই গাছের ডালে "হ্যাং" করতে পারবি। তবে নিচে থেকে তোর পায়ের পাতায় লম্বা ঘাসের ডগা দিয়ে কাতুকুতু দেওয়া হবে। কোনটা চাষ তুই?'

প্রদীপ রাগ করে গিয়ে জাম গাছে উঠল। ঝুলে পড়ল বাঁ হাতে। সবাই আমরা নিচে দাঁড়িয়ে প্রদীপের শাস্তি দেখছি।

সময় উত্তীর্ণ হলে দিলু বলল, 'নেমে আয়, প্রদীপ।'

প্রদীপ বলল, 'আমি নামব না। তিনদিন তিনরাত আমি এইভাবে ঝুলতে থাকব।'

'কিন্তু তার তো উপায় নেই, তুই হলি গিয়ে লিডার। তোর গল্পটাই আমরা সবাই উদ্ভট আর মজার বলে রায় দিয়েছি।'

'বলো কী, দিলু ভাই। সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছে।'

প্রদীপ লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল, মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল, 'প্রীদপ কুমার শর্মা—জিন্দাবাদ। লিডার প্রদীপ—জিন্দাবাদ!

দশ

রাতে আমরা সবাই ঘুমাতে গেলাম তাঁবুর ভেতরে। চারপাশে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। পালা করে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করল প্রদীপ। ভোররাতের দিকে পড়ল আমার আর দিলুর পালা। আমরা পাহারা দিচ্ছি, ঝিঁঝি পোকার ঐকতান শুনছি আর আকাশের তারা দেখছি। মিষ্টি বাতাস বইছে চারদিকে, বুনো ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি। চমৎকার লাগছে আমাদের। এই সময়ই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল দিলু, 'হু কাম্‌স দেয়ার, হল্ট!'

দিলুর হাতের গুলিভরা বন্দুক উদ্যত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি সামনে এক আবছায়া মূর্তি। বন্দুক দেখে মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। দুহাত উপরে তুলে বলল, 'ফ্রেন্ড!'

কাছে আসতে দেখি লোকটা ন্যাশনাল পার্কের কেরানি খোদাদাদ ভূইঞা। ডাকবাংলোয় আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। খোদাদাদ ভূইঞা বললেন, 'তোমরা বুঝি এখানে তাঁবু ফেলেছ ... বেশ, বেশ।'

তিনি চুরুট ধরালেন। বললেন, 'আজ সারারাত আমাদের কারো ঘুম নেই। সারারাত জঙ্গল চষে ফেলেছি। একেই বলে ভাগ্যের ফের। নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. রঙ্গন কুফুয়া ঘণ্টা দুই বাদে "লাভলী"কে নিতে আসছেন। অথচ লাভলীর কোন পাত্তা নেই। কখন যেন সুযোগ পেয়েছিল, সটকে পড়েছে বিকাল বেলা। এখন লাভলীকে মি. কুফুয়ার হাতে ফিরিয়ে দিতে না পারলে কী গতি হবে আল্লাই জানেন।'

আমি বললাম, 'লাভলী কী হয় আপনার?'

এক মুখ ফ্যাঁসফ্যাঁসে পাতলা ধোঁয়া ছেড়ে খোদাদাদ ভূইঞা বললেন, 'লাভলীকে চেনো না বুঝি। লাভলী হচ্ছে বিন্ধ্যাচল এলাকার একটা পোষা হনুমান। মি. কুফুয়া আমাদের দেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে আসার পর তাঁর শখের

হনুমানটাকে আমাদের হেফাজতে রেখেছিলেন। মি. কুফুয়ার কার্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আজ ভোর সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি মোটরে করে এখানে আসছেন লাভলীকে নিতে। কিন্তু কোথায় লাভলী!'

হতাশায় মাথা নাড়েন ভূইঞা সাহেব। বলেন, 'মি. কুফুয়াকে আমরা লাঞ্চ পর্যন্ত এখানে আটকে রাখতে পারব। এর মধ্যে দেখ তো তোমরা লাভলীর দেখা পাও কি না। আর হ্যাঁ, সাবধান, গুলি-টুলি ছুড়ো না যেন। মি. কুফুয়া বলেন, লাভলী নাকি খুব সেন্টিমেন্টাল।'

দিলু বলল, 'একটা হনুমানের জন্যে মি. কুফুয়ার অত দরদ কেন বুঝতে পারছি না ...'

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল ভূইঞা সাহেবের। বললেন, 'আসল কথা বললে খোদা ব্যাজার হবেন। তাই বলি না।'

গলার স্বর নিচু করে ভূইঞা সাহেব আবার বললেন, 'বুঝলে না, মি. রঙ্গন কুফুয়ার সাথে চেহারার আশ্চর্য মিল আছে হনুমানটার। প্রায় হুবহু এক রকমের চেহারা। যাকগে, মানুষের নিন্দা করতে নেই। তওবা, তওবা ...'

ভূইঞা সাহেব দুই গালে মৃদু চাপড় মারতে মারতে চলে গেলেন নদীর দিকে। তখনো আকাশে দু-একটা তারা আছে। চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে। পাখ-পাখালির গানে ভরে গেছে গড়। পূর্ব আকাশের মেঘগুলো ক্রমে সিঁদুরের রং ধরছে।

দলের সবাইকে হনুমানটার কথা জানানো হলো। ইতিমধ্যে আমাদের নাশ্‌তা হয়ে গেছে। গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছি সবাই। হনুমানের কথা শুনে সাজাহান ভাই-এর চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'বড় ডেঞ্জারাস জিনিস এই হনুমান। ১৯৫৭ সালে সুন্দর বনে গিয়ে আমি অবশ্য গোটা তিনেক হনুমান "ক্যাচ" করেছিলাম। কিন্তু সেই থেকে ঠিক করেছি "হান্টিং" করি আর যাই-ই করি, হনুমান বাদ দিয়ে করব।'

প্রদীপ বলল, '১৯৫৭ সালে আপনি তাহলে তিনটা হনুমান মেরেছিলেন, সাজাহান ভাই?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাজাহান ভাই বলে, 'হনুমান আবার "কিল" করতে যাব কোন দুঃখে শুনি? "কিল" করার বস্তু নাকি ওগুলো? ১৯৫৭ সালে "ওপেন হ্যান্ডে" তিনটা ধাড়ী হনুমান "ক্যাচ" করেছিলাম।'

সকালটা বেশ ভালই কাটল আমাদের। আকবর আর সাজাহান ভাইয়ের উপর খাবার তৈরির ভার দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম অরণ্যে। নদীর উপর বাঁকানো বাঁশের কঞ্চির পর বসে থাকা এক ঝাঁক মাছরাঙা পাখির একটা ছবি তোলা হলো। একটা কাঠবেড়ালী আমাদের দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাকেও তাড়াতাড়ি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হলো ক্যামেরায়। দিলু কতকগুলি রং-বেরঙের ফুল সংগ্রহ করল। তার উপর পথে গান-নাচ তো ছিলই। হৈ-হুল্লোড় করে সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম। তাঁবুতে ফিরে এলাম দুপুরের একটু আগে। ফিরে এসে দেখি তাঁবু নিস্তব্ধ। কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই।

ভেতরে ঢুকে দেখি সাজাহান ভাই মলিন মুখে বসে আছে। আকবরের হাতে বন্দুক। সাজাহান ভাই আমাদের সকলকে দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল বোঝা গেল না।

প্রদীপ বলল, 'কী ব্যাপার, আকবর ভাই?'

আকবর একবার সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে উঠে আসে। প্রদীপের কানে কানে বলে, 'মি. রঙ্গন কুফুয়ার হনুমানটা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে। বললে বিশ্বেস করবি না, হনুমানটার নজর শুধু সাজাহান ভাইয়ের দিকে। সাজাহান ভাই একবার তাঁবু থেকে সামান্য বেরিয়েছিল, অমনি হনুমানটার কি লম্ফঝম্প! সাজাহান ভাই দুই লাফে সেই যে তাঁবুতে এসে ঢুকেছে, নিজেও বেরোয় না, আমাকেও বেরোতে দেয় না।'

ভাঙা গলায় সাজাহান ভাই বলে, 'সব কথা "আন্ডারস্ট্যান্ড" করিয়ে "সে" ... করতে পা ... পারছি না, দিলু। আমি, ব্রাদার, কিছুক্ষণ আ ... আ ... গে তোতলা হয়ে গেছি!'

সাজাহান ভাইয়ের অবস্থা দেখে আর হনুমানটার কথা শুনে আমরা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সেই দুপুরে মিটিং বসল। প্রদীপ বলল, 'ঘটনা যাই হোক, সাহস "লুজ" করলে চলবে না। এখন দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কে এমন সাহসী আছে যে হনুমানটাকে ধরতে পারে। নিদেনপক্ষে এই জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে জানোয়ারটাকে।

কেউ টুঁ শব্দ করল না। ফলে চোদ্দটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরোর একটায় 'হনুমান' কথাটা লিখে টুকরোগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো। প্রত্যেকেই খুশি মতো একটা টুকরো উঠিয়ে নিল। দেখা গেল সাজাহান ভাইয়ের কাগজে 'হনুমান' কথাটা লেখা। অর্থাৎ শর্তমাফিক সাজাহান ভাইকেই এখন হনুমানের মোকাবেলা করতে যেতে হবে।

দলপতি প্রদীপ বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আসল কথা হলো সাহস। সাহসের কাছে হনুমান কিচ্ছু না। আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থায়ই ...'

সাজাহান ভাই বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে জামার হাতা গুটাচ্ছিল। আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'চুপ! আর একটাও কথা বলবি তো "লং জাম্প" দিয়ে এসে পড়ব। "ক্লিন মার্ডার" করে ফেলব কিন্তু, হ্যাঁ।'

সবাই চুপ। সাজাহান ভাইয়ের চোখ-মুখ ভয়ে, আশঙ্কায় চুপসানো। হাতা গুটানো শেষ হলে সাজাহান ভাই প্রায় কাঁপতে কাঁপতে জুতোর ফিতে বাঁধল। একবার বাঁধা পছন্দ না হওয়ায় ফিতে সম্পূর্ণ খুলে আবার বাঁধল। বিড় বিড় করে বলল, 'ভারী একটা হনুমান, তাকে বুঝি ভয় করি আমি, হুঁ! একবার পেয়ে নিই হনুমানের বাচ্চা হনুমানকে, সমানে লাথি চালাব। এই সাজাহানের একটা লাথি আগে খাক জানোয়ারটা। তখন বুঝবে ভদ্রলোকদের খামোখা উৎপাত করার মজাটা কী।'

কিছুক্ষণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিল সাজাহান ভাই। বাইরে যাওয়ার সব প্রস্তুতি তার শেষ। জুয়েল বাইরে গিয়ে হনুমানটার অবস্থান দেখে এসেছে। সে তাঁবুতে ফিরে এসে জানাল হনুমানটা আগের জায়গা ছেড়ে তাঁবুর আরো কাছে একটা বদ্দিরাজ গাছের নিচু ডালে বসে আছে। ভয়ঙ্কর নাকি দেখতে জানোয়ারটা।

'ওয়াটার দে ...' সাজাহান ভাই আদেশ দেয়। প্রায় মিনিট পনেরো সময় ধরে একটু একটু পানি খেল সাজাহান। তারপর মুখ মুছে হঠাৎ ভাঙা গলায় প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বরং না গেলাম, প্রদীপ। কী বলিস ...'

'কিন্তু ...'

সাজাহান ভাই সবই বুঝল। প্রায় সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল। বাইরে এল। আমরাও পেছনে পেছনে এলাম। এসে দেখলাম সত্যি সত্যি একটা বিপুলকায় হনুমান কোলে হাত রেখে বদ্দিরাজ গাছের ডালে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। সাজাহান ভাইকে দেখে হনুমানটা কিচিরমিচির শব্দ করে লম্ফঝম্প দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল।

'দেখলি, জন্তুটার ব্যবহার "সি" করলি?' সাজাহান ভাই মর্মাহত হয়ে কাঁপা গলায় অভিযোগ করল। বলল, 'বল দেখি, দিলু, তোরা যে এরকম একটা অসভ্য বিস্টের কাছে আমাকে পাঠালি—আমি এখন কী করি। ইডিয়েটটা এক বিন্দু ইংলিশ জানে না ... বকাবকি করেও তো লাভ নেই। এই দ্যাখ, দ্যাখ কী রকম ভ্যাঙাচ্ছে ... উঃ, এই অপমান একদম সহ্য করা যায় না।'

'এগিয়ে যান, সাজাহান ভাই,' প্রদীপ ভয়ে ভয়ে উপদেশ দিল, 'তাড়া করে এগিয়ে গেলে দেখবেন হনুমানটা ভয়ে পালিয়ে গেছে ...'

'এগিয়ে যাব ... "ইউ মিন প্রসিড" করব? "নো, নো ইম্পসিবল" ...'

'ইম্পসিবল? কেন, সাহাজান ভাই ... ?'

'স্ট্যান্ডোফবিয়া!'

'স্ট্যান্ডোফবিয়া, সে আবার কী, সাজাহান ভাই?'

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে সাজাহান ভাই বলে, 'স্ট্যান্ডোফবিয়া কী তা কি আমিই ঠিক জানি, ব্রাদার। হাইড্রো-ফবিয়া আছে, সাইকো-ফবিয়া আছে ... মনে হলো স্ট্যান্ডোফবিয়াও থাকতে পারে! স্ট্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডে, ... স্ট্যান্ড হলো দাঁড়ানো। তাহলে স্ট্যান্ডোফবিয়া হলো গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার রোগ। আমার পা বসে গেছে, দিলু। বলছ বটে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, কিন্তু আমি প্রসিড করতে পারছি না ...'

এই সময় হনুমানটা দু-তিনটা গাছ টপকে একদম মাথার উপরকার একটা গাছের ডালে এসে বসল। সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ভেংচি কাটল, তারপর ডালে দাঁড়িয়ে উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল।

সাজাহান ভাইয়ের গলার স্বর একেবারে ভেঙে গেছে। দিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাচছে তো, দেখবে এক মিনিটের মধ্যেই কেমন একটা "লো" জাম্প দেয়। উঃ, জানোয়ারটার মধ্যে একটু যদি ভদ্রতাবোধ থাকত।'

সাজাহান ভাই দাঁড়িয়ে থেকে ঝিমোতে লাগল। বলল, 'দিলু, মনে কোরো না আমি ভয় পেয়েছি। ভয় আমি পাই নি, ব্রাদার। হনুমানজীর অভদ্র ব্যবহারে আমি আসলে "ইনসাল্টেড্ ফিল" করছি। আর শোনো, এই রকম দাঁড়ানো অবস্থা থেকে আমি যদি সটান ঝুপ করে পড়ে যাই, তাহলে ফিট হয়ে গেছি তা যেন থিঙ্ক কোরো না। স্ট্যান্ডোফবিয়ার কথা বললাম না, এটা হলো স্ট্যান্ডোফবিয়া।'

দিলুর উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলছিল সাজাহান ভাই। কিন্তু কোথায় দিলু। কখন যে দল থেকে পিছু পিছু সরে পড়েছে, তা কেউ টের পায় নি। হঠাৎ এক পাশে তাকিয়ে আমরা ভীষণ আঁতকে উঠলাম। হনুমানটা যে ডালে বসে আছে, সেই ডালের কাছাকাছি আর একটা গাছে বসে আছে দিলু। হাতে এককাঁদি পাকা সাগর কলা।

'কাম, কাম ...' হনুমানটাকে দিলু ডাকল। হনুমানটা সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ দেখল দিলুকে! তারপর সে কী উদ্দাম নৃত্য, সে কী কিচিরমিচির গান! এ-ডালে সে-ডালে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল হনুমানজী। তারপর এক সময় লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল দিলুর উপর। আমি আশঙ্কায় চোখ বুজলাম। চোখ খুলে তাকিয়ে আমরা সবাই তাজ্জব! হনুমানটা দিলুর কোলে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় মাথা ঘষছে। আর দিলু একটা একটা করে কলা সেঁধিয়ে দিচ্ছে হনুমানজীর মুখে।

এই সময় একদল লোক এসে পৌঁছল সেখানে। খোদাদাদ ভূইঞা একজন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রদূত মি. রঙ্গন কুফুয়া। দিলু ততক্ষণে লাভলীকে নিয়ে নেমে এসেছে নিচে। মি. রঙ্গন কুফুয়া লাভলীকে পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

ওরা যাওয়ার পর আলো জ্বালিয়ে আমরা বাইরে বসলাম। আকবর আর গজা রান্নার জোগাড়ে লাগল। কেরোসিনের চুল্লি জ্বালিয়ে চা করতে বসল জুয়েল। সাজাহান ভাই বলল, 'যাক, হনুমানটা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের একটা উপকার করে গেল!'

'কী রকম?' প্রশ্ন করে সুনির্মল।

'এটা বুঝতে পারছিস না, তেতো ওষুধ কোথাকার! বলি, হনুমানজী না এলে স্ট্যান্ডোফবিয়ার কথা জানতে পারত আজকের এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি? দাঁড়া না, এবার ফিরে গিয়ে স্ট্যান্ডোফবিয়ার ওপর রিসার্চ করব! ছেড়ে দেব ভেবেছিস? কখ্খনো না—সাজাহান ওরকম লোকই না!'